সূর্য্যে যে সকল গুণ বিদ্যমান, তাহাই ঘনীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়, তজ্জন্য সূর্য্যালোকের ন্যায় দীপালোক, গ্যাসালোক ও তড়িতালোকে রজনীর অন্ধকার বিনাশ করে। পিত্ত শব্দে যাহা তাপিত হয় বা তাপ প্রদান করে, তাহাকে বুঝায়। এই পিত্ত, সূর্য্য বা অগ্নিরই তাপ এবং বায়ুর গতিশক্তি বা স্পন্দন ও কম্পন হইতে সেই তাপের উদ্ভব। বিকৃতি দ্বারা, প্রকৃতি নির্ণীতা হয়। জ্বর দেহের স্বাভাবিক তাপের বিকৃতি। বিকৃতি শব্দে হ্রাস, বৃদ্ধি। দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৮° ডিগ্রী, জ্বরে সেই তাপের বৃদ্ধি এবং জ্বর বিচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে সেই তাপের হ্রাস, এউভয়ই দোষের—উভয়ই প্রকৃতির বিকৃতি। পরন্তু এই হ্রাস ও বৃদ্ধির যে মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, তাহাই সাম্যাবস্থা এবং এই অবস্থাই জ্বর বিহীন অবস্থা। এই যে বিকৃতাবস্থা ইহা হইতেই প্রকৃতাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বলা বাহুল্য সে অবস্থায় ও হ্রাসবৃদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তবে এত অল্পমাত্রায় থাকে যে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। জ্বর, দেহের স্বাভাবিক তাপেরই বিবৃদ্ধি এবং বায়ুর স্পন্দন বা কম্পন হইতেই উহার উদ্ভব, আর তাহার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস ও নাড়ী দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয়। অতএব বায়ুর স্পন্দন বা কম্পন হইতেই তাপের উৎপত্তি এবং যেখানে বায়ু নাই, সেখানে গতিশক্তি বা কম্পন নাই, আর যেখানে গতিশক্তি বা কম্পন নাই, সেখানে তাপও নাই, সুতরাং তাপ সর্ব্বতোভাবে বায়ুর অধীন।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ঋষির কথা যে সত্য, বায়ু হইতে তাপের উৎপত্তিই তাহার প্রমাণ। যেমন বায়ুর কম্পন হইতে তাপের উদ্ভব, তদ্রূপ আকাশ হইতে বায়ুর উদ্ভব এবং জাগতিক সকল বস্তুই আকাশ পদার্থের পরিণাম। আকাশই বায়ুর চলন গুণে ও চাপে সন্তপ্ত হইয়া উঠে ও তাহা হইতে তেজস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই তেজস্তত্ত্বও বিশ্বপরি-চালনী মহাশক্তির একটি প্রধানতম অঙ্গ। বেদান্তে বহুস্থানে এই তত্ত্বকে ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব সাধনার একটি প্রধানতম অবলম্বন। বৈদিক উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা গায়ত্রীর, সেই উপাসনাও তেজস্তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া, তদ্ব্যতীত বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়াকাণ্ডেই অগ্নি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অগ্নিই এই সকল সাধনার প্রধানতম অবলম্বন। তন্ত্র বলেন, আমাদিগের দেহস্থ অগ্যাধার যে মণিপুর পদ্ম, তাহার ধারণা ও সাধনা মনঃসংযম ও ঈশ্বর তত্ত্বে উপনীত হইবার প্রধানতম উপায়। এইরূপ কি সাধন বিষয়ক, কি বিজ্ঞান বিষয়ক সকল শাস্ত্রেই সর্ব্বত্র তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অগ্নির স্থান কেন এত উচ্চে অগ্নির ক্রিয়া ও গুণ আলোচনা করিলে, তাহা বুঝা যায়। বিশ্বপ্রকাশের প্রধানতম বিভাব, রূপের প্রকাশ। বিশ্বপ্রকাশ বলিতে গেলেই আমরা সাধারণতঃ রূপের প্রকাশ বুঝি। জাগতিক বস্তু সকলকে রূপ প্রদান করা তেজের কার্য্য। জগতের উপাদানভূত মূলপদার্থ সকলকে তেজ উপযুক্ত পরিমাণে পাচিত করিয়া বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক সংযোগ বা বিয়োগের দ্বারা

একটি নূতন পদার্থ সঙ্গঠন ও প্রকাশমান করে। এইরূপে বস্তু সকল প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত বা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগৎকে বহুরূপে প্রকাশমান করিতেছে। বস্তু সকলকে রূপান্তরিত বা পরিণামিত করা তেজের কার্য্য, আবার পরিণামিত রূপ সকলকে প্রকাশিত করাও তেজের কার্য্য। বায়ুর চলন গুণে তেজ ও চলগুণ-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ ও প্রকাশ্য উভয়বিধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। শাস্ত্রকারগণ বলেন ;—

"তৈজসাস্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষ তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ"।

সূর্য্য—তেজের আধার, রূপ, বর্ণ, তাপ, প্রকাশমানতা, পরিপাকশক্তি, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শৌর্য্য ইহারা সূর্য্যতেজেরই বিকার, বা অবস্থান্তর। রূপের ঘনীভূতাবস্থা আলোক বা অগ্নি। সূর্য্যোত্তাপে বস্ত্র দগ্ধ হয় না, কিন্তু সূর্য্যকান্ত মণির সংযোগে সূর্য্যালোক ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রাদি দগ্ধ করে। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত, কবিভূষণ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের জন্য যেসকল মহাত্মা মাসিকদান, ও এককালীন দান করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত টাকার উল্লেখ করিতেছি—

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন অধ্যাপক, এম, সি, কালেজ শ্রীহট্ট ২৲
,, অধ্যাপক এ, হাকিম ... ৪৲
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, পূর্ণিয়া ২৫৲
,, ডাঃ এস্, সি, চক্রবর্ত্তী আই, এম, এস শ্রীহট্ট ... ...২৲
,, ডাঃ ডি, এন্, মুখোপাধ্যায় কটক, ১০৲
,, এচ্ সান্ন্যাল অমরাবতী-বেরার ... ৩৲
,, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া, ২৲
,, মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট, ভবানীপুর ২৫৲
শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৲
,, ডাঃ মদনমোহন দত্ত ১০৲
,, ডাঃ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল, উকীল হাইকোর্ট ৪৪, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, মাসিক ২৫৲ হিঃ—১৫০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত এন, সি, সেন স্কোয়ার বার-এট্-ল, ১ম দফায়—২০৲
,, যমুনাদাস গোয়েনকা ৩, বেয়ারাপটী ১৬৲
ডবলিউ সি গ্রেহাম্......১০০৲
,, হিরণ্যমোহন দাশগুপ্ত উকীল, বগুড়া ৫৲
,, প্রবোধচন্দ্র রায় . . ৫০৲
,, তারণকৃষ্ণ লস্কর ৬, ইইলিয়মস্ লেন কলিকাতা......১০০৲
,, সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক ৪, বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন, ১ম দফা—২০৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রাহা ১০০০৲
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি জমিদার নিমতিতা ৫০০০৲

(ক্রমশঃ)

সূচী।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়া গ্রন্থাগারের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন—

৺গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তক—(১) সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ (সটীক) (২) কলাপ ব্যাকরণ (সটীক) (৩) ভট্টিকাব্য (সটীক) (৪) কাতন্ত্র পরিশিষ্ট (৫) রঘুবংশ (সটীক) (৬) পিঙ্গল সূত্র (৭) কুমার-সম্ভব (সটীক) (৮) গণপ্রদীপ (৯) কবিকল্পদ্রুম (১০) রচনানুবাদ শিক্ষা (১১) উত্তররাম চরিত (১২) ছন্দোমঞ্জরী (১২) শ্রুতবোধ (১৪) ত্রিবেদীয় নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি (১৫) সন্ধিস্থবস্তু করচা (১৬) কোষসংগ্রহ (১৭) অমর কোষ (১৮) বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিনী (১৯) শব্দকল্পদ্রুম (২০) মিত্রলাভ।

পরমবিদ্যোৎসাহী ৺বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তক—সার রাধাকান্ত দেবের রচিত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের নাগরাক্ষরে মুদ্রিত উত্তম সংস্করণ ১ সেট্।

ডাঃ গণপৎ পাণ্ডুরঙ্গ কোঠেঠাখে এ-এ-এম, এস মহাশয়ের প্রদত্ত পুস্তক—(১) ফিরঙ্গ রোগ ও পূয়প্রমেহ (২) How to preserve health ? (৩) রোগজন্তু (৪) স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি (৫) অশক্ততা।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৴০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরাজ এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। ১৫ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই কলম		৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক	,,	৪৷৷০
,,	সিকি ,,	,,	আধ	,,	২৸০
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি	,,	১৷৷০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ

২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

আয়ুর্ব্বেদ
মাসিক পত্র ও সমালোচক।
সম্পাদক
কবিরাজ-শ্রীবিরজা চরণ গুপ্ত কবিভূষণ
,, শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন
এম.এ., এম.বি।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৴০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯. ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৩—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটীর পাঁচটীতেই আমরা সাধারণ ভারতবাসী—বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটিতে বাস করিতে পাই না; স্নান পানের জন্য পবিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম গুলি জঙ্গলে পুর্ণ হইয়া উঠিতেছে—প্রচুর সূর্য্যালোক আসে না। মাটি পচায়, গাছ পচায়, বায়ু অনেক স্থানে দূষিত হইয়াছে, আমরা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাই না। রোগ-ক্লিষ্ট, শোক-দষ্ট, অন্নাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ, কোটি কোটি নরনারীর আর্ত্তরবে আকাশ পর্য্যন্ত বিদুষিত হইয়াছে, শূন্য প্রাণে শূন্য পানে চাহিয়াও আমরা সান্ত্বনা পাই না। দুর্দ্দশায় আমাদের শান্তি স্বস্তি অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। কি করিব, আমরা নির্ব্বাচিত সদস্যপূর্ণ মন্ত্রণা সভা লইয়া? কি করিব, কমিটি, বোর্ড, কৌন্সিল লইয়া? কি করিব, উচ্চ, নীচ, সুলভ, দুর্ল্লভ, শিক্ষা লইয়া? কি করিব, সভাগৃহ মধ্যে রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে অবাধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লইয়া? আর কি করিব, 'রাজা' 'রায় বাহাদুর' 'স্যর হইয়া? আমরা তৃষ্ণার জল পাই না, শীতে রৌদ্র পাই না, স্বাস্থ্যর মাটী পাই না, গ্রীষ্মে বিশুদ্ধ বাতাস পাই না; আমরা যে জ্বরে উজাড় হইতে বসিয়াছি, আমরা যে পুষ্টিকর প্রচুর আহার অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। ভেজাল খাদ্য খাইয়া আমাদের যে নিত্য দেহের বল কমিতেছে, হৃদয়ের সাহস টুটিতেছে, প্রাণের স্ফুর্ত্তি ঘুচিতেছে।

রাস্তা, বাঁধ, জাঙ্গাল, সড়ক—সমগ্র ভারতে নিত্যই বাড়িতেছে। গোলোক ধাঁধার মত পথের জটিলতায় লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি না। স্থল পথের কিঞ্চিৎ সুসার হইয়াছে বটে কিন্তু জল নিকাশীর পথ প্রচুর না থাকায় বন্যার জল বৃষ্টির জল বাহির হইতে পারে না। মাটিতে ক্রমাগত জল বসিতে থাকে; কাজেই ভুমি হইয়াছে ম্যালেরিয়ার বিহার ক্ষেত্র। শুষ্ক ভূমিতে বাস করিতে চিকিৎসক উপদেশ দেন, কিন্তু

ভূমিতে জল বসিলে, ভূমি শুষ্ক থাকে কিরূপে? সুতরাং বাস্তু ভূমি সকল বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আবার নদী গর্ভ ক্রমে ভরিয়া উঠিতেছে,—তবে বল দেখি, এ দেশের আর মঙ্গলের আশা কোথায়?

পূর্ব্বে ধনী মধ্যবিত্তের ধর্ম্ম-প্রাণতা ছিল, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নব পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হইত; এখন আর সে ধর্ম্মপ্রাণতা নাই—কিন্তু প্রাণরক্ষা ত চাই; ভাল জলের সংস্থান না করিলে নদী বিহীন পল্লীগ্রাম টিকিতেই পারে না। এ বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার পর দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে। কতক আমাদের উদাসীনতায়, কতক আমাদের আলস্যে, আর কতক আমাদের লোভে। বাগাত জমিতে গাছ পালা চিরকালই আছে ও থাকিবে; কিন্তু বাস্তু উদ্বাস্ত—আমরা লোভ পরবশ হইয়া আমের কলমে লিচুর কলমে ভরিয়া ফেলিতেছি। যাহার জমি আছে সে বাগান করুক, কিন্তু বাস্তু উদ্বাস্ত জঙ্গল করিও না। মাঠাল জমিও বাগাতে পরিবর্ত্তন করিও না। জঙ্গলে ভূমি শুষ্ক হইতে পায় না, তাহাতে বাস্তর বিলক্ষণ ক্ষতি হয় এবং ক্ষেত্রে বাগান করিলে শস্য-সম্ভার কমিয়া যায়। আগাছা একটু বড় হইলেই পূর্ব্বে লোক কাটিয়া ফেলিত; এখন পাথুরে কয়লা জ্বালানি হওয়ায়, আগাছার তত টান নাই, বড় বড় আগাছায় নগরের ও গ্রামের উপকণ্ঠ একবারে ভরিয়া উঠিতেছে। আলস্যে ও উদাসীনতায়, আমরা সেগুলি কাটাইবার বন্দোবস্ত করি না। কিন্তু না করিলে আর চলে না। আপনার অবস্থা, আপনার গ্রামের অবস্থা, আপনার জেলার অবস্থা—ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া দেখ; দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে, আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায়—আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, আপন ভিটায়, আমরা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারি, তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। নদী গুলির বহতা বজায় রাখিতে হইবে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, বাটীর আশেপাশের জঙ্গল কাটাইয়া ফেলিতে হইবে।

শরীর রহিলে, ধর্ম্মসাধন হয়, লোক-যাত্রা সাধন হয়; শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কিছুই হয় না। কোন কিছু ভালও লাগে না। যাহাতে সুস্থ শরীরে নিজের ভিটায় বাস করিতে পার, তাহার জন্য প্রথমে নিজে চেষ্টা কর, জঙ্গল কাটাইবার পয়সা না জুটে, প্রত্যহ স্বহস্তে নিজে কাটিতে থাক; তাহার পর প্রতিবাসীর জঙ্গল কাটাইবার জন্য, জনের জনের বাড়ীতে গিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাদিগকে বন কাটাইতে লওয়াও। গ্রামের মাথাল মাথাল লোকদের বল, ফাঁড়ীর জমাদারকে বল, থানার দারোগাকে বল, নদী বহতা করাইবার জন্য জমিদার মহাশয়কে বল, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে বল, লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে পাহাড় টলান যায়!

শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণপণা বল, ধন বল, যশ বল,—শরীর রহিলেই সব! যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া দু'দিন বাঁচিতে পারি—তাহার জন্য অগ্রে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টাকে "আভ্যন্তর নীতি" বলিতে হয় বল, প্রজানীতি বলিতে হয় বল,—এই জন্য রাজ পুরুষদের

নিকট যে ক্রন্দন আবেদন নিবেদন—তাহাকে 'রাজনীতি' বলিতে হয় বল—কিন্তু এই চেষ্টা এখন কিছু দিন করা চাই। সর্ব্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া এই কার্য্যে লাগিয়া যাও; উদাসীনতায়, আলস্যে, নির্ব্বুদ্ধিতায়, আসল খোয়াইয়া নকলের জন্য লালায়িত হইওনা।

সমস্ত বাজে কথা ও কাজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া আমাদের বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা অগ্রে ভাবিতে হইবে। যাহার যতটুকু সাধ্য স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাকে ততটুকু চেষ্টা করিতে হইবে। যে মহাপুরুষ —তিনি সন্ন্যাসী হউন, গৃহী হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, ব্রাহ্ম হউন খৃষ্টান হউন, বাঙ্গালী সাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া দিতে পারিবেন,—তিনিই দেশের প্রকৃত বন্ধু। আমরা অস্বাস্থ্য-তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও। এই এত কাল ধরিয়া বাঙ্গালার মাসিক পত্র পর্য্যালোচনা করিলাম, কই একথার গুরুত্বের উপলব্ধি ত কোথাও দেখিলাম না! সংবাদ পত্রেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হয় না, কেবল "অমৃত বাজারে" কিছু থাকে, দু'এক খানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ও একটু আধটু স্বাস্থ্যের কথা থাকে—কিন্তু প্রাণের কথা প্রাণ দিয়া লেখা ত দেখিতে পাইনা! অমৃত বাজার বলেন—"কলিকাতার লোকে জল-কষ্ট বা জ্বর-কষ্ট কিছুই বুঝে না, সেই জন্য কিছুই লেখে না।" তবেই ত, কলিকাতা আমাদের মাথা—মাথায় না লাগিলে মাথা ব্যথা হইবে কেন? কলিকাতার বড় লোকদের সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, আমরা এই মধ্য শ্রেণীর সম্প্রদায়—আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারি না কি? নাই বা হইলাম "রামমূর্ত্তির" মত জোয়ান, সুরেন্দ্র বাবুর মত বক্তা, ডাক্তার ঘোষের মত আইনজ্ঞ, ঠাকুর কুমারের মত ধনশালী, আমরা সামান্য লোক—এই সামান্য বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত লইয়া, প্রতিজনে চেষ্টা করিয়া, আমাদের নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়া, একটু আরামে দুইদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি না কি?

বঙ্গদর্শনের আমল হইতেই আমি এই স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু অলস বাঙ্গালী কথাটা শুনিয়া ও শুনে না। তাই আমাদের হেম, নবীন অকালে মরিয়াছে, রামেন্দ্র, প্রফুল্ল—যৌবনেই বুড়া হইয়াছে, আমার কর্ম্ম ক্ষেত্রের সঙ্গী আর কেহই বাঁচিয়া নাই। আছে—এক পাঁচকড়ি, বাঙ্গালীর দুঃখ ব্যথা সে কতকটা বুঝিয়াছে, বাঙ্গালীর কথা সে গুছাইয়া বলিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাদের জন্য সে কাঁদে, তারা তা'কে চিনিতে পারিল না।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কলিকাতার কবিরাজ মহাশয় ত "আয়ুর্ব্বেদ" বাহির করিলেন,—বুড়া হইয়াছি, মঙ্গলকামনা করিতে পারি—কামনা পূর্ণ হউক। আমি ত কয়েক বৎসর ধরিয়া একঘেয়ে কান্না কাঁদিয়া স্বাস্থ্যে ও সাহিত্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, মানব-স্বাস্থ্য যাঁহাদের বেদ—আমার চেয়ে তাঁরা কথাটা ভাল করিয়া লোককে বুঝাইতে পারিবেন।

যাঁহারা "আয়ুর্ব্বেদ" পরিচালনা করিবেন, আমি তাঁহাদের সকলকে চিনি না। তবে যে দুইজন কর্ণধার হইয়া কাগজের মলাটে

নাম লিখাইয়াছেন—তাঁহাদের চিনি। যামিনী-ভূষণ—প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় চিকিৎসা-বিজ্ঞা-নেই কৃত-বিদ্য। বিরজা চরণ—কুচবিহারের রাজ-বৈদ্য,—আমার পরম প্রীতি-ভাজন প্রবীণ সাহিত্য-সেবী অম্বিকাচরণ গুপ্তের কনিষ্ঠ। আয়ুর্ব্বেদের এই দুই কর্ণধার,—ইহাঁদের উত্তর-সাধক আমার প্রিয় ছাত্র - দুকাণ কাটা ব্রজবল্লভের উজ্জল মন্তব্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অমূল্য ইঙ্গিতে স্বাস্থ্য যেমন হিতকারী, সাহিত্যে তেমনই মনোহারী। তাই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া আমি—এই ত্রিমূর্ত্তিকে শার্টিফিকেট্ দিয়া ফেলিলাম।

বাস্তবিক, আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়া আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। প্রাচীন মতের অনুবর্ত্তন—চিরদিনই আমাদের পক্ষে মঙ্গল জনক। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে, কাবাব কাটলেটের মমতা ছাড়িয়া, আবার তাহাকে ঋষিহস্ত প্রসারিত পল্‌তার ডাল্‌নার ভক্ত হইতে হইবে।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

আমাদের কথা।

বহুদিন—বহুদিন পরে, মায়ের ছেলে আবার মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে!

তিমির-কুটিলা রজনীতে, কাহাকে ও না বলিয়া, সে যখন অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিয়া-ছিল, তখন তাহার কৌতুক-তরল নেত্রে "নূতনের" মোহ! সে তখন ভাবে নাই—এই মোহই একদিন তাহার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিবে! ঝঞ্ঝালুণ্ঠিতা ধর-ণীর প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে—তাহার সেই গুপ্ত-পদক্ষেপ, তখন কেহ শুনিতেও পায় নাই।

অনেক দ্বারের লাঞ্ছনা সহিয়া,—আপনার সমস্ত সঞ্চয় শূন্য করিয়া, শ্রান্তদেহে, মলিন মুখে, আজ সেই হৃতসর্ব্বস্ব হতভাগ্য মাতৃ-মন্দিরের সিংহদ্বারে ফিরিয়া আসিয়াছে! কিন্তু কৈ, তাহার অভ্যর্থনার জন্য, পুরদ্বারে ত তূর্য্যধ্বনি হইল না? মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া, জলের ঝারি দিয়া, লজ্জা-ললিত মুখের অব-গুণ্ঠন সরাইয়া, কুলবধূগণ ত তাহাকে বরণ করিতে আসিল না? তাহাকে পথ দেখাই-বার জন্য চন্দ্রশালার চূড়ে দীপালোক জ্বলিয়া উঠিল না? হায়! সমস্ত আপনার জন কি আজ তাহার এত পর হইয়া গিয়াছে!

অনুতপ্তের স্পর্শে—রুদ্ধ দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল। পলাতক পুত্র বড় ভয়ে ভয়ে সেই জনশূন্য বৃহৎ পুরীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। দেখিল—পুষ্পিত গুল্মলতায় শ্যামায়-মান বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন—অতীত গৌরবের শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে! সে বাটীর আর কেহই বাঁচিয়া নাই! যাহারা মরিয়াছে—তাহাদের চিতা চুল্লীর অর্দ্ধদগ্ধ চন্দন কাষ্ঠ হইতে তখন ও ধূম নির্গত হইতে ছিল। সেই নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নির প্রেতালোক "কঞ্চু-কীর" মত কুমারকে পথ দেখাইল। সে প্রতিকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিল, অক্ষয় ভাণ্ডার এখনও অনন্ত রত্নে পূর্ণ। তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অবিকৃত, কেবল অনেক দিনের অনাদরে বিশৃঙ্খল। এখন ও সেই পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে—কতকগুলি জীর্ণ কীট-

দষ্ট পুঁথি—"যকের" মত তাহার অমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতেছে। যে, মার কোল ছাড়িয়া যুবক চলিয়া গিয়াছিল, উদাসীন সন্তানের মঙ্গল কামনায় সেই মা প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় দেবতার দ্বারে যে মাথা খুড়িয়াছিল, এখনও কক্ষমধ্যে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান! চির-প্রতীক্ষা-শীল, ক্ষুণ্ণ পিতৃস্নেহ—অসংখ্য দর্শন বিজ্ঞানের পুঁথিতে পরিণত হইয়া অর্জ্জুনের অক্ষয় কবচের মত এখন ও কক্ষমধ্যে তাহার মঙ্গল ধ্যান করিতেছে!

যুবক আরও দেখিল—তাহার জন্য যে সকল অপূর্ব্ব খাদ্য প্রস্তত হইয়াছিল, এখনও তাহা তেমনই ঢাকা রহিয়াছে—মাতৃস্নেহের মন্দার-মধু তাহাকে বিকৃত হইতে দেয় নাই। তাহার আরোগ্য কল্পে সযত্নে আহৃত "জড়ী বুটীর পুঁটুলী" এখনও কক্ষ গাত্রে—টাঙ্গান' রহিয়াছে!

যুবক আর এক কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষে—তাহারই জন্য একদিন শান্তি স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল। এখনও সহকার-পল্লব-পেলব মঙ্গল-কলস গৃহ মধ্যে শোভা পাই-তেছে! যুবক আর থাকিতে পারিল না, অনুতাপে তাহার বুক ফাটিতে ছিল, উচ্ছ্বাসা-কুল বেদনাপ্লুত হৃদয় দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, কম্পিত কণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া একবার মা বলিয়া ডাকিল! মানব নয়নের কুহেলী আবরণ ভেদ করিয়া—তাহার সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! যুবক দেখিল—এই ত সেই মা! দৈন্যের মধ্যে ও তেমনি মহিমান্বিতা! আমার জন্ম জন্মান্তরের অস্ফুট স্মৃতি—আমার ভবিষ্যতের চিরোজ্জ্বল আশা, কে বলে তুমি মরিয়া গিয়াছ? তোমার ত মৃত্যু নাই! আত্মহারা হইয়া আমি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি আমার ইহকাল পরকালের মধ্যে—নাদের বন্ধনী। তুমি আমার-কর্ম্ম, ভক্তি জ্ঞান—"ত্রয়ী" তুমি আমার সুখ দুঃখের অভিব্যঞ্জনা—ওঙ্কার; তুমি আমার জীবনে মরণে সর্ব্বময়ী! তুমি আমার আমিত্বের অধ্যাস, কর্ম্মের জিজ্ঞাসা, সমাধির নিদ্রা! আমার অনাচারে তুমি জীর্ণ জড়ের মত হইয়াছিলে, সেই মোহ প্রাপ্ত মাতৃদেহ আমি চিতা শয্যায় তুলিয়া দিয়া ছিলাম! সে চিতায় জ্ঞান বিজ্ঞান পুড়াইয়া আগুণ ধরাইয়া ছিলাম,—অবোধ আমি, আলো দেখিয়া, তাপে মাতিয়া, পিশা-চের মত কঙ্কালের করতালি দিয়া, চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম! এখন বুঝিতেছি—সে অগ্নি মাতৃঘাতী, তাহাতে আমার দেশ পুড়িয়াছে, বিজ্ঞান পুড়িয়াছে, সর্ব্বস্ব পুড়ি-য়াছে! তাই নয়ন জলে—আজ চিতা নির্ব্বাণ করিতে আসিয়াছি। এসো মা এসো—আয়ুর্ব্বেদের জীবনীয় স্নেহে—তোমার অঙ্গের দাহস্ফোট শীতল করিয়া দিই। তোমার কমকলেবরের সমস্ত কালিমা মুছিয়া দিয়া—তাহাতে হরিচন্দন লিপ্ত করি!

"ভেবেছিনু আমি বুঝি দীন মাতৃহারা?
আজ দেখি—মা ত' কভু নহে গৃহ ছাড়া!
সর্ব্বময়ী মা আমার সর্ব্বঘটে আছে।
দিন রাত আছি আমি মায়েরই যে কাছে!
নিদাঘে মা "ষষ্ঠী" রূপা—বট বৃক্ষ মূলে,
দেশের অনাথ শিশু কোলে লন তুলে,
বরষাতে "দশহরা" মকর-বাহিনী।
তৃষিতে তুষিতে—বুকে স্নেহ মন্দাকিনী!
শরতে সারদা মাতা—দুর্গা দশভুজা,
লক্ষ্মী ভেবে পূর্ণিমায় করি তাঁরি পূজা!
আমার আঁধারে "কালী" তারা মা আমার,
করে—"বরাভয়" "মুণ্ড" "খড়্গ" তীক্ষ্ণ-ধার!

হেমন্তে মা "জগদ্ধাত্রী"—রাজরাজেশ্বরী,
শস্ত পূর্ণা বসুন্ধরা রূপে আলো করি।
শিশিরে মা "বীণাপাণি" শত-দল পরে,
বসন্তেতে "অন্নপূর্ণা" দর্ব্বী পাত্র করে!
মা আমার বিরাজিত ষড়ঋতু মাঝে!
চারিদিকে দেখি আমি মা'র মহিমা যে!"

বলিতে হইবে কি, উপকথার পলাতক যুবক আর কেহই নহে—আমরাই। আমাদের পরিত্যক্ত ভদ্রাসন—নিখিল বিজ্ঞানের সূতিকা-গৃহ "আয়ুর্ব্বেদ।" আমরা পত্র সূচনায় বলিয়াছি—দেশ রক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই "আয়ুর্ব্বেদকে" বাঁচাইতে হইবে।

আমরা যে মানুষের বংশধর, আমরা যে জাতির বনিয়াদ,—মোহ মদিরায় মুগ্ধ হইয়া তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ভুলিয়া কীট পতঙ্গের দলে মিশিয়াছিলাম! একদিন আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিভা যে জগজ্জ্যোতি রূপে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহা আমরা ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। এখন সে মোহ নিদ্রা ভাঙিয়াছে। সহস্র বর্ষব্যপী কৃষ্ণ বিরহের জড়তা ঘুচিয়াছে। প্রিয় দর্শনের আশায় আবার আমরা মিলনের প্রভাসক্ষেত্রে একত্র হইয়াছি। "আয়ুর্ব্বেদের" কথাই আমাদের কৃষ্ণকথা। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ঐশ্বর্য্য একদিন অরুণ কিরণে শত ময়ূখ মালায় প্রাচী-গগনোপান্ত সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল।

তাঁহাদের মহত্বের মহাশ্মশানে আজ আমরা দণ্ডায়মান! ভুলিয়া যাও ভাই! নিশার দুঃস্বপ্নের কথা; ভুলিয়া যাও সে প্রবল ভৈরব ফেরুনাদ, ভুলিয়া যাও সে নর কপালের খট মট বিকট ধ্বনি; ভুলিয়া যাও—নিশাচরের করাল কণ্ঠের হলহলা রব; যে চিতা-ভস্মকে তুমি আজ সামান্ত জ্ঞান করিয়া ভাসাইয়া দিতেছ, তাহা ভস্ম নহে—ভারতের বিভূতি। সেই বিভূতি-ভূষণকে অঙ্গরাগ করিতে পারিলে, তুমি শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে।

তোমরা হয় ত বলিবে,—আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, আবার চরক, সুশ্রুত, হারীত, অগ্নিবেশকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" এ কথায় আমাদের আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস—বিশ্ব-সত্যের চিরন্তন দিব্য মানব চরক, সুশ্রুত—তাঁদের ত মৃত্যু হয় নাই। কালধর্ম্মে তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আবার আসিবেন। এসো আমরা তাঁহাদের আগমনী ঋক্ উচ্চারণ করি! নিশ্চয়ই তাঁহারা উত্তর দিবেন।

আমরা মন্ত্র জানিনা, সূত্রার্থ ভুলিয়াছি, বহ্নি বিসর্জ্জন দিয়া, ধূম্রগন্ধি অন্ধকারে জড়ের মত বসিয়া রহিয়াছি। কিন্তু অতীতের মোহ ত ভুলিতে পারি নাই। যে দিন ভাবী আশার কল্পনা দুই চ'খ ভরা অশ্রুর আড়ালে তাহার সোহাগের সপ্তবর্ণ লুকাইয়াছে, সেই দিন হইতেই ত অহরহ কেবল অতীত স্মৃতির রোমন্থন করিতেছি! অধম অযোগ্য আমরা—কিন্তু "মানুষ আমরা নহিত মেষ"। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর—জন্মেজয়ের সর্পসত্রের ন্যায় আমরা "ব্যাধিসত্র" করিব। বশিষ্টের "পুত্রেষ্টির" ন্যায় আমরা এদেশে বেদেষ্টির অনুষ্ঠান করিব। আমাদের দেশ হইতে 'মড়ক মহামারী' চলিয়া যাইবে, প্রাচীন ঋষির আত্মা আবার এদেশে নবজন্মে নবদেহে পুনরাবির্ভূত হইবে।

তোমরা আমাদের সহায় হও। আমরা ক্ষুদ্র, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ত ক্ষুদ্র নহে। আজ কাল, তোমাদের কাছে প্রত্নতত্বের

আদর বাড়িয়াছে, খাল, বিল, পুষ্করিণী হইতে প্রস্তর ফলক, ধাতুমূর্ত্তি কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে তাহা রক্ষা করিতেছ, নষ্ট লিপির পাঠোদ্ধারের ভার লইতেছ, কিন্তু যাহা হারাইয়াছে—একবার সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া, একাগ্রভাবে তাহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা—একবার করিবে না কি? "আয়ুর্ব্বেদ" তোমাদের পুরাতন সম্পত্তি,—তোমাদের স্পর্দ্ধার সামগ্রী, গৌরবের জিনিষ,—সেই আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা কর,—মানুষ আবার দেবতা হইবে।

বেদের যজ্ঞে—আমরা সকলকেই আহ্বান করিতেছি, সকলেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। বেদের দেশে জন্মিয়া, শক্তি থাকিতে যিনি এযজ্ঞে যোগদান না করিবেন—তিনি মানবের বন্ধু নহেন! তাঁহার দেশ-হিতৈষণা শুধু বিড়ম্বনা! এদেশের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে—কত অসংখ্য নর নারী—ব্যাধি শয্যায় শয়ন করিয়া, আরোগ্যের আশায় শীর্ণবাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ঈশ্বর-চরণে হৃদয়ের আকুল নিবেদন জানাইতেছে; কত সুখের সংসারে কত ভয়ার্ত্তা জননী—রুগ্ন শিশুর মরণাহত সুকুমার দেহ কোলে করিয়া বসিয়া নয়ন জলে ধরণী সিক্ত করিতেছে! জীবনের ফুল্ল বসন্তে কত প্রেমিক যুবকের শেষ নিশ্বাস পৃথিবীর বুকে মিশিতেছে; কত মিলন-সুখ-ফুল্ল নব দম্পতীর—সাধের কুঞ্জে মৃত্যুর ঘোর বিভীষিকা দেখা দিতেছে; বৃদ্ধা জননীর স্নেহের ক্রোড়ে—একমাত্র বংশধর মহা নিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের শেষ অবলম্বন কালের ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—কই কেহই ত তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না। এদেশে মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকা দিন দিন বিসর্পিত হইতেছে, মহাকাল নিত্য নিত্য নূতন ব্যাধির আমদানি করিতেছেন, অথচ এদেশের প্রতি গৃহের পার্শ্বে,—প্রত্যেক কুটীরের অঙ্গনে, কত সহজ, কত অনায়াস-লভ্য মহৌষধি বিদ্যমান রহিয়াছে! সুচিকিৎসার অভাবে কত,সুখ-সাধ্য রোগ – প্রাণঘাতি-ভীষণ-মূর্ত্তিতে আত্ম প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যে সকল কথা লিখিলাম ইহা ত সাধারণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য ঘটনা। দেশের এরূপ অবস্থা দেখিয়া, যাঁহার প্রাণ কাঁদেনা—মানবাভিধানে বোধ হয় তাঁহার নাম স্থান পাইবে না! আমাদের বিশ্বাস—এই ব্যাধি-ব্যাপন্ন দীন দেশে কেহই আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইবেন না। তাই সাহস করিয়া আজ আমরা সকলেরই সাহায্য চাহিতেছি। যাঁহার যে শক্তি আছে তাহা লইয়াই আমাদের সাহায্য করুণ। আমরা সাধারণের পরিচারক, যথাসাধ্য সম্ভার সংগ্রহ করিয়া, কৃতাঞ্জলি কৃত করপুটে ভক্তির পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া, দেশের লোকের পরিচর্য্যায় আত্ম-নিয়োগ করিলাম। যতদিন জগতে রোগ থাকিবে, অকাল মৃত্যু থাকিবে,—ততদিন আমরা যজ্ঞমণ্ডপ হইতে কোথায় যাইব না। যখন দেখিব—একখানি শোক-মলিন মুখ ও মানব বিজ্ঞানের অপূর্ণতার পরিচয় দিতেছে না—তখন বুঝিব আমাদের পূর্ণাহুতির কাল নিকটে আসিয়াছে।

রত্নমালিনী রাজপুরীর ভগ্নাবশেষের সহিত—আমরা আয়ুর্ব্বেদের তুলনা দিয়াছি। এই বৃহৎ অট্টালিকার অনেকস্থান ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কত ভূমিকম্প বাত্যা, বৃষ্টি, ইহার উপর হিল্লোল তুলিয়াছে, কাল-তটিনী কালিন্দী ইহার পাদমূলে তরঙ্গাঘাত করিয়াছে, যুগ-

যুগান্ত ধরিয়া অধিকারীর অনাদরে ইহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহার বিরাট বিপুল আয়তন দণ্ডায়মান। এই ঋষি-মনীষা-রচিত কল্যাণ-মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিতে হইবে, স্থানে স্থানে —নূতন হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। বহুকাল ধরিয়া যাহা ভাঙ্গিয়াছে—একদিনে তাহার সংস্কার বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ও কার্য্য নহে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বহু সময় সাপেক্ষ। ইহা একজনের বা এক দলেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা একজন্ম ধরিয়া যেটুকু পারি —করিব, ব্যক্তি মরে—সম্প্রদায় মরেনা,— সুতরাং আমরা ভরসা করিতে পারি, আমাদের অবর্ত্তমানে নূতন সম্প্রদায় আসিয়া অপূর্ণ অংশের পুরণ করিয়া দিবেন। তাহার পর এক পুরুষ, তাহার পর আর এক পুরুষ, এই রূপ জন্ম জন্মান্তরের অশ্রান্ত সাধনার যে মন্দির নির্ম্মিত হইবে,—তাহার চূড়া বিমান ভেদ করিয়া দেবতার চরণ স্পর্শ করিবে।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে সময় চাই, মানুষ চাই, কুবেরের ভাণ্ডার চাই। উন্নতির প্রথম সোপান—আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও রুগ্নাবাস প্রতিষ্ঠা করা। সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—আজ আমরা সকলের কাছেই ভিক্ষার্থী। এক পয়সা হইতে এক লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত—আমাদের বেদ-ভাণ্ডারে—আমাদের ভিক্ষার ঝুলিতে, সমান আদরের জিনিষ। বেদরক্ষার জন্য, আপনাদের যাহা সাধ্য, ভিক্ষা দিন। এ ভিক্ষায় ভগবান্কে ভিক্ষা দেওয়া হইবে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ তো হাত পাতিয়া ভিক্ষা করেন না। অনাথ আতুরের হাত পাতাই তাঁহার হাত পাতা। জীবকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যিনি ভিক্ষা দেন, তিনি দেবতাকে ভিক্ষা দেন। ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জ্ঞান, গৌরবে—এদেশকে যাঁহারা জগতে শীর্ষস্থানীয় দেখিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের সহায় হউন। সপ্তর্ষির মত উচ্চে বসিয়াও যাঁহারা মরণাহত পল্লীবাসীর মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারেন, আমরা তাঁহাদিগকেই কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। এই অসীম বিরাট সত্বার মধ্যে, আমাদের 'হাসি কান্না' জড়িত ক্ষুদ্র জীবন কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে; আমাদের আশা কামনা ভোগলিপ্সা—সূর্য্যাস্তের বর্ণরেখার মত একদিন নীরবে মিলাইয়া যাইবে, আমাদের তুচ্ছ প্রাণবিন্দু পুষ্পদলচ্যুত শিশির কণার মত কবে ভাগীরথীর সাগরাভিমুখ জলতরঙ্গে নিঃশব্দে মিশিয়া যাইবে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন বেদরক্ষায় আমরা যেন সত্যযুগের 'বিসর্জ্জন' দেখাইতে পারি।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

অগ্নি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ণও পার্থিব বস্তু নহে,—সূর্য্যের তেজ, আকাশে নীল পীতাদি যে সকল বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা আকাশে সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতের ফল। ইহাই আদিবর্ণ। এই সকল বর্ণের সমাবেশে নানাবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপ শব্দে পদার্থের আকার বুঝায়। যে ইন্দ্রিয়ের

প্রভাবে পদার্থের সেই আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই রূপেন্দ্রিয় বা চক্ষু। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন হয়, সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ও সূর্য্যের তেজ। যেমন নাসিকাদ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা বাহিরের বায়ুর সহিত সংযুক্ত আছি, তদ্রূপ চক্ষের দ্বারা বাহিরের তেজ গ্রহণ করিয়া সেই তেজের সহিত আমরা সংযুক্ত রহিয়াছি। ভ্রাজিষ্ণুতা শব্দে প্রকাশমানতা, প্রকাশমানতা তেজের ধর্ম্ম, তেজ ব্যতীত কোন পদার্থ প্রকাশমান হইতে পারে না। পক্তি শব্দে পরিপাক শক্তি, খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়াও তেজের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। অমর্ষ শব্দে ক্রোধ, ক্রোধ তেজেরই প্রভাব। তীক্ষ্ণতা শৌর্য্য বা শূরত্ব তেজের অন্যতম ধর্ম্ম। এক্ষণে দেখা গেল, রূপ, রূপেন্দ্রিয়, বর্ণ, তাপ, ভ্রাজিষ্ণুতা, পক্তি, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শূরত্ব ইহারা একমাত্র তেজেরই অবস্থান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং তেজ সূর্য্যেরই শক্তি। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বাহিরের মহাশক্তির অধীনে সর্ব্বদা কালযাপন করিতেছি। যেমন বাহিরের বায়ু ব্যতীত, আমরা এক মুহূর্ত্ত ও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, তদ্রূপ বাহিরের তেজ ব্যতীত ও আমরা এক মুহূর্ত্ত ও জীবিত থাকিতে পারিনা।

পিত্ত।

শরীরস্থ তেজের নাম পিত্ত। পিত্ত পাঁচ প্রকার—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জক পিত্ত যকৃত ও প্লীহাতে, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচক পিত্ত নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্ব-শরীরে এবং চর্ম্মে অবস্থিতি করে।

পাচক পিত্ত।

পাঁচ প্রকার পিত্তের মধ্যে পাচক পিত্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্য চতুর্ব্বিধ পিত্ত পাচক পিত্তেরই অপ্রধান অংশ বা শাখা প্রশাখা। পাচক পিত্তের ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে অন্যান্য পিত্তের ও ক্ষয় বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। পাচক পিত্ত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, অপরাপর অগ্নির বল বৃদ্ধি এবং রস, মূত্র ও মলকে পৃথক্ করে। এই অগ্নি অবিকৃত থাকিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সৌন্দর্য্য, মেধা, বুদ্ধি, শূরত্ব, দেহের কোমলতা, পরি-পাক, তাপ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। পাচক পিত্ত পীতবর্ণ এবং উহাতে উষ্মা বা তাপাংশ অধিক। যেমন দীপের আলোক গৃহের একাংশে অবস্থান করিয়া অন্যান্য অংশকে আলোকিত করে, তেমন পাচক পিত্ত স্বীয় আশয়ে অবস্থিত থাকিয়া সমগ্র দেহকে আলোকিত করে।

রঞ্জক পিত্ত।

রঞ্জক পিত্তের স্থান যকৃৎ। ইহা ভুক্ত দ্রব্যের রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করে। ("রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ")। রঞ্জক পিত্তে রঞ্জনগুণ অধিক, ইহার মুখ্য বা প্রধান ক্রিয়া ভুক্ত দ্রব্যের রস-রঞ্জন এবং গৌণ বা অপ্রধান ক্রিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক। রঞ্জক পিত্ত নীলবর্ণ, ইহা রসকে রঞ্জিত ও সুপক্ক করিয়া, দেহ ধার-ণোপযোগী শোণিতে পরিণত করে। আধু-নিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সূর্য্যের নীলালোক দ্বারা পৃথিবীর পদার্থ সমূহের সংযোগ ও বিয়োগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং পীতালোক দ্বারা প্রধানতঃ দৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ ও তাহাই বলেন। দেহে সূর্য্য-তেজের বিকাশ

নীলবর্ণ রঞ্জক পিত্তের সংযোগে ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ রসের বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে অথবা ঐরস রঞ্জিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে, ইহাই রসের সহিত নীলবর্ণ পিত্ত সংযোগের রাসায়নিক কর্ম। যকৃৎ পিত্তাধার, যকৃতের উপর পিত্তের থলীতে এই পিত্ত নিহিত। রঞ্জক পিত্ত অপক্ক বা নিস্তেজ পিত্ত, উহাতে উষ্মা বা তাপ অত্যল্প, যেমন নীলাকাশ সূর্য্যেরই একাংশ ও তদ্দ্বারা পৃথিবীর রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, নীলবর্ণ রঞ্জকপিত্ত ও তদ্রূপ প্রধান পাচক পিত্তের একাংশ এবং তদ্দ্বারা ভুক্তান্নের পরিপাক ও ভুক্তান্নজাত রসের রঞ্জনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রধান পাচক পিত্ত পক্ক, পীতবর্ণ এবং সমধিক আগ্নেয়। তন্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে।

"তস্মাত্তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোষ্মা যঃ স পক্তিমান্।"
স কায়াগ্নিঃ স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্।
স সঞ্চরতি কুক্ষিস্থঃ সর্ব্বতো ধমনীমুখৈঃ॥

তেজোময় পিত্তের উষ্মা বা তেজই পক্তিমান্। উহাই কায়াগ্নি, কায়োষ্মা, অন্নাদির পাচক এবং উহাই জীবের জীবন। উহা কুক্ষিতে অবস্থিতি করিয়া ধমনীমুখ দ্বারা সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করে।

সাধক পিত্ত।

"যত্ সাধকসংজ্ঞং তৎ
কুর্য্যাদ্বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিং।"

যে পিত্তদ্বারা বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি জন্মে, তাহাই সাধক পিত্ত। সাধক পিত্তের কার্য্য মনোবৃত্তি সকলের উৎকর্ষতা সাধন ও বুদ্ধি, মেধা এবং স্মৃতি প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত কার্য্যকরী করিয়া তোলা ও সেই সকলকে যথাযথরূপে নিয়ন্ত্রিত করা।

আলোচক পিত্ত।

"যদালোচক-সংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারণম্।"

যে পিত্তদ্বারা রূপ দর্শন হয়, তাহার নাম আলোচক পিত্ত। আলোচক পিত্তের অবস্থিতি স্থান দর্শনেন্দ্রিয়। দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোচক পিত্ত আছে বলিয়াই আমাদিগের, দর্শনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। চক্ষের পীতবর্ণ রেখা সমূহের জ্যোতিতে পদার্থ নয়ন গোচর হয়। আর এই জ্যোতি দ্বারাই আমরা বাহিরের তেজের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছি। যেমন নাসিকা দ্বারা আমরা বহির্ব্বায়ুর আকর্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি, তদ্রূপ চক্ষের দ্বারাই আমরা বাহিরের তেজ আহরণ করিয়া তেজের প্রকাশন ও পরিপাককরণ প্রভৃতি ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকি। আমরা কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া থাকিলে আমাদিগের নিদ্রা আইসে, কারণ চক্ষু মুদিয়া থাকিলে আমাদের সহিত বাহিরের তেজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং বাহিরের তেজের প্রকাশন গুণ আমাদিগের মধ্যে আহৃত হইতে না পারায়, তমোগুণের আবরণ শক্তি প্রবল হইয়া, আমাদের প্রকাশশক্তিকে বিলুপ্ত করিয়া, নিদ্রাভিভূত করিয়া দেয়। শ্রুতি বলেন, চক্ষের অন্তর্গত তেজস্তত্ত্বে সেই পরমাত্মা পরম পুরুষ বিরাজমান। গীতায় বলা হইয়াছে—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণীদিগের দেহাশ্রিত হইয়া প্রাণও অপানের যোগে চতুর্ব্বিধ ভোজ্য পরিপাক করি।

সুশ্রুতে বলা হইয়াছে—

জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদানো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে॥

অন্নাদির পাককর্ত্তা জঠরাগ্নি প্রভৃতি সকলই সেই ভগবান পরমেশ্বর।

বস্তুতঃ যে শক্তি আমাদের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। যে শক্তি আমাদিগের ভুক্তান্ন জীর্ণ করিয়া, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা শুক্র প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত করিয়া শরীর সংগঠন, পোষণ ও প্রকাশন প্রভৃতি যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি প্রভৃতি যাবতীয় মানসক্রিয়া, দর্শন, প্রকাশন ও উত্তেজন প্রভৃতি যাবতীয় স্নায়বীয় ক্রিয়া ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য, সুতরাং তাহা একমাত্র পরম দয়াল পরমেশ্বরের শক্তি ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে ?

ভ্রাজক পিত্ত।

ভ্রাজকং কান্তিকারি স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচনম্।

যদ্দ্বারা অঙ্গে প্রলিপ্ত দ্রব্যাদি শোষিত ও পরিপক্ক হইয়া অঙ্গের শোভা সম্পাদন বা রোগবিমোচন করে, তাহাই ভ্রাজকপিত্ত।

মৃদু ও তীব্র দহন ক্রিয়া।

সূর্য্যোত্তাপে পৃথিবীর রস শোষিত হয়। অগ্নির তাপে জল সহযোগে ডালভাত তরিতরকারি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের পাকক্রিয়া সমাধা হয়। ইহাকে মৃদু দহন ক্রিয়া বলা যায়। তীব্র দহন ক্রিয়ায় কাঠ কয়লা প্রভৃতি ভস্মীভূত হয়।

ডাল ভাত তরকারি প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু অগ্নিতাপে তদ্রূপ দগ্ধ হয় না, রূপান্তরিত এবং লঘু ও কোমল হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়, অপিচ উদরে গিয়া উদরাগ্নি সংযোগে পুনর্ব্বার রূপান্তরিত হইয়া রস, রক্ত ও মাংসাদিতে পরিণত হয়। ইহাকেই ভুক্তান্নের পরিপাক বা মৃদু দহন-ক্রিয়া বলা যায়। সূর্য্য, অগ্নি ও পাচক পিত্তের ক্রিয়া অভিন্ন। সূর্য্য, তেজ বা অগ্নিবস্তুই শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত হইলে অশুভ এবং অকুপিত থাকিলে শুভফল প্রদান করে, সেই শুভ ও অশুভ বা মঙ্গল ও অমঙ্গল এই—

পক্তিমপক্তিং দর্শনমদর্শনং মাত্রামাত্রত্বমুষ্মণঃ প্রকৃতির্বিকৃতির্বর্ণঃ শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধং হর্ষং মোহং প্রসাদমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বানীতি।

পরিপাক ও অপাক, দর্শন ও অদর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রায় সমতা ও বিষমতা, প্রকৃতি ও বিকৃতি, বর্ণ ও অবর্ণ, শৌর্য্য ও অশৌর্য্য, ভয় ও অভয়, ক্রোধ, ও অক্রোধ, হর্ষ ও অহর্ষ, মোহ ও অমোহ, প্রসাদ ও অপ্রসাদ ইত্যাদি এবং এইরূপ আরও অনেক লক্ষণ আছে।

পরিপাক, দর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রা, প্রকৃতি, বর্ণ, শৌর্য্য, অভয়, হর্ষ ও অপ্রসন্নতা এই সকল অক্ষুণ্ন থাকা অকুপিত পিত্তের তথা স্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং পরিপাকের পরিবর্ত্তে অপাক, দর্শনের পরিবর্ত্তে অদর্শন, শারীরিক তাপের বিষমতা, প্রকৃতির বিকৃতি, বর্ণের বিপর্য্যয়, শূরত্বের অভাব, ভয়, ক্রোধ, হর্ষের অভাব, মোহ ও অপ্রসন্নতা এই সকল পিত্ত বিকৃতির তথা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। পরিপাক হইতেই দর্শনাদি শুভফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অগ্নিই দেহস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুফল ও কুফলের উৎপাদন করে, পরিপাক প্রভৃতি সেই সুফল এবং অপরিপাক প্রভৃতি সেই কুফল। বস্তুতঃ ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপক্ক হইলে, দর্শনাদি

শারীরিক্ সমস্ত ক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, আর ভুক্তান্নের অপাক হইতেই বিবিধ বিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

রোগস্তু দোষ-বৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।

দোষের বৈষম্য রোগ এবং দোষের সমতা অরোগ।

দোষ শব্দে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহাদিগের বৈষম্যাবস্থায় দেহ অসুস্থ হয়। বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থায় থাকিলে দেহে প্রসাদভূত রক্তাদি সার পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উঁহাদিগের বৈষম্যাবস্থায় রস-রক্তাদি সার পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সার পদার্থের বৃদ্ধির অবস্থা স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং ক্ষয়ের অবস্থা অস্বাস্থ্যের অবস্থা। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থায় দেহধারক ও দেহ-পোষক, সেই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই বৈষম্যাবস্থায় দেহ পীড়ক ও প্রাণনাশক। দোষের এক নাম মল, দোষের বৈষম্যাবস্থায় মলাংশ এবং সাম্যাবস্থায় সারাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঘর্ম্ম, নাকের সিকনী, মুখের থুথু, কাশ ও বমনের পিত্ত প্রভৃতি মল পদার্থ বাচ্য এবং রসরক্তাদি প্রভৃতি সারপদার্থবাচ্য। সুশ্রুতে বলা হইয়াছে, বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাই দেহোৎপত্তির হেতু এবং তাহারা অবিকৃত থাকিলেই দেহ সুস্থ থাকে, আর বিকৃত হইলেই দেহ অসুস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চরকে বলা হইয়াছে—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতি দ্বিবিধ। প্রাকৃতী গতি ও বৈকৃতী গতি।

পিত্তাদেবোষ্মণঃ পক্তি র্নরাণামুপজায়তে।
তচ্চ পিত্তং প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্।
প্রাকৃতস্ত বলং শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে।

যে পিত্তের উষ্মা হইতে পরিপাক শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই পিত্ত প্রকুপিত হইলে আবার বহুবিধ বিকারের সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ যে শ্লেষ্মা শরীরের বলকর, সেই শ্লেষ্মাই মলজনক। দেহের বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা কিরূপভাবে অবস্থান করিতেছে ও দেহ সুস্থ আছে কিনা, তাহা পাচকাগ্নির বলাবল ও ক্রিয়া দ্বারা জানা যায়। পাচকাগ্নি চতুর্ব্বিধ—

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।

মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি, বিষমাগ্নি ও সমাগ্নি। এই চতুর্ব্বিধ অগ্নি—বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার বৈষম্য ও সাম্য অবস্থা হইতে উৎপন্ন।

কফ-পিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ।

কফাধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থায় সমাগ্নি। এই চতুর্ব্বিধ অগ্নির মধ্যে সমাগ্নি শ্রেষ্ঠ, অগ্নির সাম্যাবস্থায় কোন বিকারের সৃষ্টি হয় না। অন্য ত্রিবিধ অগ্নি হইতেই বিকারের সৃষ্টি হয়।

বিষমো বাতজান্ রোগাংস্তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥
সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নে র্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ॥
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে।
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে॥
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ॥

বিষমাগ্নি হইতে বাতজরোগের, তীক্ষ্ণাগ্নি হইতে পিত্তজ রোগের এবং মন্দাগ্নি হইতে কফজ রোগের উৎপত্তি হয়। এই চতুর্ব্বিধ অগ্নির মধ্যে সমাগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ সমাগ্নি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে এবং সমান মাত্রায় সমভাবে পানাহার সম্যক্ পাক করে।

মন্দাগ্নি অল্পমাত্রায়ও ভোজ্যবস্তু পাক করিতে সমর্থ নহে। বিষমাগ্নি কদাচিৎ সম্যক্ পরিপাকে সমর্থ হয়, আবার কখনও বা সম্যক্ পরিপাকে সমর্থ হয় না। অতি মাত্রায় আহার পানীয় পরিপাক করা তীক্ষ্ণাগ্নির কার্য্য। কফ, পিত্ত ও বাতের প্রকোপ হইতে যথাক্রমে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ উৎপন্ন হয়।

ত্রিবিধ অগ্নি হইতে ত্রিবিধ বিকারের সৃষ্টি হয় বলিয়া ত্রিবিধ অগ্নিই অপাকের মধ্যে পরিগণিত এবং এই অপাক হইতেই দর্শনাভাব বা অদর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রার বিষমতা, প্রকৃতির বিপর্য্যয়, বর্ণবিপর্য্যয়, শূরত্বের অভাব. ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, মোহ বা অজ্ঞানতা ও অপ্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, কিন্তু ত্রিবিধ অগ্নির মধ্যে মন্দাগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নিতো দূরের কথা, এক্ষণে বিষমাগ্নির লোকও বঙ্গদেশে বিরল, পরন্তু মন্দাগ্নির লোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বলা বাহুল্য ইহা বাঙ্গালীর শোচনীয় দুর্দ্দশার চরম পরিণাম। তবে বেশী দিনের কথা নহে, বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ অবস্থা ছিল না, তখনকার লোকে মন্দাগ্নি বা বদ্‌হজম কাহাকে বলে, জানিত না, পাথর খাইয়া হজম করিত। দুই একজনের নহে, প্রায় অধিকাংশ লোকেরই তখন অগ্নি প্রবল ছিল। ফলাহারের উপকরণ ছিল দই, চিড়ে ও গুড়, তাহাই তখনকার লোকে কত তৃপ্তির সহিত আহার করিত। এখন আর সে কালও নাই সে মানুষও নাই বা সে বলবীর্য্য বা দেহের লাবণ্যকান্তি কিছুই নাই। প্রায় প্রত্যেকেই অবসাদগ্রস্ত, কঙ্কালসার, বিষণ্ণ বদন, যেন আনন্দ চিরদিনের মত তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেন, আজ বদ্‌হজম হইয়াছে, কেহ বা বলেন, চোঁয়া ঢেকুর উঠিতেছে, কেহ বা বলেন, আজ পেটে বড় উইও জন্মিয়াছে, ইত্যাকার আক্ষেপোক্তি আজ কাল সচরাচর প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উদরাময় বা বদ্‌হজম আজ কাল যেন বঙ্গদেশে সংক্রামক রোগে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক বিরল, যাঁহার পেটের অসুখ বা বদ্‌হজম নাই। যিনি বার্লির পরিবর্ত্তে মাছের ঝোল ভাত আহার করেন, তিনিই এক্ষণে মহা ভাগ্যবান্। বড় বেশী দিনের কথা নহে, দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে তীক্ষ্ণাগ্নির লোক ছিল, এরূপ এক ব্যক্তিকে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহার নাম আধমোণী কৈলাস, নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর নামক গ্রামে। এই ব্রাহ্মণ প্রায় সর্ব্বদাই কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার ব্যবসায় ছিল শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি ক্রিয়া উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ ভোজন ও ভোজন দক্ষিণা আদায়। তাঁহার নামের পূর্ব্বে যে বিশেষণ তাঁহাকে বিশেষিত করিয়াছে, তাহা তখনকার কলিকাতাবাসী অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার অমিত-ভোজন দর্শনে সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতেন, বিস্মিত হইবারই কথা, এককালে অর্দ্ধমণ ভোজন বিস্ময়কর ব্যাপার নহে কি? তিনি চিকিৎসক শিরোমণি স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ্যে প্রায়ই আহার করিতেন, কারণ সেন মহাশয় তাঁহাকে আহার করাইয়া যেমন প্রীতিলাভ করিতেন, তিনিও সেখানে আহার করিয়া অনুরূপ

সন্তোষলাভ করিতেন। একদিন ৺কৈলাস শর্ম্মা আবদার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেখ তুমি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ভোজন দক্ষিণা যাহা দিতেছ, আমি যে কয়েক জনের ভোজ্য ভোজন করিব, আমাকে সেই কয়েকজনের ভোজন দক্ষিণা দিতে হইবে, সে দিন তিনি এই কথা বলিয়া লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি অৰ্দ্ধ মোণ আহার করিয়াছিলেন এবং ৺ সেন মহাশয়ও তাঁহার আবদার মত দশ টাকা ভোজন দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। কৈলাস শর্ম্মা অনুগ্রহ করিয়া একদিন আমার বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পেটের অসুখ করিয়াছিল। আসিয়া বলিলেন, আমাকে অগ্নিকুমার দেও, আমি তাঁহার আদেশমত অগ্নিকুমার দিলাম, কিন্তু "একটি" দেখিয়া তিনি ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, তুমি তো দেখিতেছি "মস্ত কবিরাজ" তোমার এমন বুদ্ধি! যাহার আধ মোণ খোরাক, তাহাকে দিয়াছ একটি অগ্নিকুমার! দশ বিশটা দিতে হয়!! একালের নব্য যুবক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিবেন কি না বা এসকল উপন্যাসের গল্প মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। হায় সেই একদিন, আর এই একদিন! তখন অতি বৃদ্ধ যাঁহারা, তাঁহাদিগের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই চস্‌মা ব্যবহার করিতেন, আর এখন চস্‌মাধারীর সংখ্যা করা যায় না, তাও আবার সবই নব্য যুবক ও বালক! হরি হরি এই তো দেশের অবস্থা! এই তো আমাদিগের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবস্থা! এই তো তাঁহাদিগের দূরদর্শন! তাঁহারা চস্‌মা ব্যতীত সম্মুখের মানুষটি দেখিতে পান না! অণুবীক্ষণ ব্যতীত অণুটি দেখিতে পান না, আর তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ চস্‌মা-ব্যতীত বৃদ্ধাবস্থা পরম সুখে অতিক্রম করিয়াছেন এবং প্রাচীন ভারতের ঋষিরা দিব্যচক্ষে সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানের" স্বরূপ দর্শন করিতেন। এই তো আমাদিগের তেজ! এই তেজের আবার গর্ব্বই কত! ইহারা মনে করে যেন ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নির্ব্বোধ এবং ঋষিরা অতিশয় অজ্ঞান ছিলেন! সমধর্ম্মী সমধর্ম্মীর আকর্ষক, "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।" বস্তুতঃ আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বা সংযমী না হইলে, কি করিয়া তাঁহাদিগের তেজ ও বীর্য্যের বা জ্ঞান-গৌরবের মহিমা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিব? কোথায় সেই তেজ, কোথায় সেই বীর্য্য, আর কোথায়ই বা সেই রজস্তমোগুণ নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল দিব্য জ্ঞান! আবার ভারতে— বাঙ্গালায় সেই ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও দিব্যজ্ঞান কবে ফিরিয়া আসিবে? কবে আমাদিগের জীবন ও সংসার মধুময় হইবে? সেই তেজ ব্রহ্মতেজ, সেই তেজ অগ্নির তেজ, যে তেজের প্রভাবে কপিলমুনি ষষ্টি সহস্র সগর সন্তানকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন! সেই তেজ, অগ্নির তেজ, যে তেজের বলে অৰ্দ্ধ মোণ খাদ্য পরিপক্ক হয়। সেই অগ্নি সত্ত্ব ও রজোবহুল। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ, সেই গুণ অগ্নি ও সূর্য্যে বিদ্যমান, যে গুণে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই গুণে আহার পরিপক্ক ও দেহের তমোগুণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহের অগ্নি দেহের পাচক পিত্ত, সেই পাচক পিত্তেও এই তেজ ও প্রকাশ ধর্ম্ম বিরাজমান, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের অভাবে পিত্ত বিকৃতি ঘটে ও তাহার ফলে অগ্নি নিস্তেজ ও দেহ নির্ব্বীর্য্য

হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন সে তেজের গুণ উপলব্ধি করা যায় না, অপিচ—অপাক বা অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় ও ক্রমশঃ তাহা হইতে অদর্শনাদি পিত্ত-বিকৃতির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ত্রিবিধ অগ্নি হইতে অপক্তি, এবং অপক্তি হইতে অদর্শন, উষ্মার অমাত্রত্ব বা বিষমতা, প্রকৃতি ও বর্ণের বিপর্য্যয়, অশৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, হর্ষাভাব বা বিষাদ এবং মোহ ও অপ্রসন্নতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কাঠ কয়লার যে শক্তিতে রেল ষ্টীমারের এঞ্জিন বা কল পরিচালিত হয়, সে শক্তি—সূর্য্য-শক্তি। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের এ কথা সত্য,—সূর্য্য-তেজের আধার, সেই তেজ যাহাতে অধিক নিহিত, তাহাকেই তৈজস বস্তু বলা হয়, তৈজস দ্রব্যে অগ্নির সংস্পর্শ ঘটিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে। গন্ধক, সোরা প্রভৃতি এই শ্রেণীর দ্রব্য। কাঠ কয়লায়ও সূর্য্যশক্তি নিহিত আছে বলিয়াই তাহা অগ্নিসংস্পর্শে জ্বলে। কয়লার সংযোগে এঞ্জিনের যে শক্তি, খাদ্যের সংযোগে দেহরূপী এঞ্জিনের সেই শক্তি, কিন্তু যদি দেহের পরিপাক শক্তি অত্যন্ত নিস্তেজ হয়, তাহা হইলে খাদ্য পরিপাকে সমর্থ হয় না। এঞ্জিনের অগ্নি নিস্তেজ হইলে কি কয়লা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়? অতএব অগ্নিই যে তেজের আধার এবং সেই তেজ হইতেই যে পরিপাক শক্তি, বল, বর্ণ ও শৌর্য্য বীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের বাঙ্গালী বর্ত্তমানে অগ্নিহীন, সুতরাং নিস্তেজ ও দুর্ব্বল, কঙ্কালসার, কোটরগত চক্ষু, স্ফূর্ত্তিবিহীন মুখমণ্ডল, পাণ্ডুবর্ণ দেহ, যেন দেশের বালক ও যুবকগণ অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় অকস্মাৎ জরাক্রান্ত হইয়াছে। ত্রিবিধ অজীর্ণ ও মন্দাগ্নিই এই দুরবস্থার মূল কারণ। অদর্শন শব্দে দর্শনাভাব, চক্ষের দ্বারা দর্শন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, অক্ষিগত রোগ উৎপন্ন হইলে দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে। উষ্মা শব্দে পিত্তের তাপ। পিত্ত স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিধা বিভক্ত। স্থূল পিত্ত দৃশ্যমান ও সূক্ষ্ম পিত্ত অদৃশ্য। অদৃশ্য পিত্তই উষ্মা বা তাপ নামে অভিহিত। বিকৃতি দ্বারা প্রকৃতি নির্ণীতা হয়। তেজের কি প্রকৃতি, কি শক্তি কি গুণ ও কি ক্রিয়া, চক্ষের ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তদ্রূপ অগ্নির প্রকৃতি, তাহার বিকৃতি দ্বারা জানা যায়। মন্দাগ্নি বা অজীর্ণ উপস্থিত হইলে অগ্নি কি বস্তু, উপলব্ধি করা যায়। জ্বরে সন্তাপিত অবয়ব হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, তাপ কি বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আবার ঐ তাপ যখন প্রবৃদ্ধ হইয়া ১০৬।১০৭ ডিগ্রীতে পরিণত হয়, তখন দেহে কি পরিমাণ উষ্মা বা তাপ অবস্থিতি করিয়া কিরূপে খাদ্য পরিপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এই যে তাপ, এই তাপ অস্বাভাবিক, স্বাভাবিক তাপে শরীর সুস্থ থাকে এবং দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে শরীর সবল ও সতেজ করে, তজ্জন্য এই তাপ দূষিত পিত্তের ক্রিয়া বলিয়া গণ্য। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে—

দর্শনং পক্তিরুষ্মা চ ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহমার্দ্দবম্।
প্রভা প্রকাশো মেধাচ পিত্তকর্ম্মাবিকারজম্॥

দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি, উষ্মা বা তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের মৃদুতা, কান্তি, প্রকাশ বা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রসন্নতা ও মেধা এই সকল অব্যাহত থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাত, পিত্ত শ্লেষ্মার গতি দ্বিবিধ—প্রাকৃতী ও বৈকৃতী। প্রাকৃতী গতির ফলে দেহে প্রসাদভূত বাত, পিত্ত ও

শ্লেষ্মার প্রসাদগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও তাহার ফলে রস রক্তাদি সারবস্তুর পরিমাণ বাড়ে বলিয়া শরীর সুস্থ থাকে, আর বৈকৃতীগতির ফলে দেহের মলভূত বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া বাতের অস্বাভাবিক শোষণ গুণে, পিত্তের অস্বাভাবিক দহনগুণে ও শ্লেষ্মার অস্বাভাবিক আর্দ্রতায় শরীরের রসরক্তাদি সার পদার্থসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া দেহের ক্ষয়সাধন করে। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা দেহোৎপত্তি এবং দেহধারণ ও দেহ পোষণের হেতু। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্বভাবে অবস্থিতি করিলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, সেই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বাস্থ্য ও দেহ নাশ করে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা অপর কিছুই নহে, পদার্থের আশয় বা স্থানচ্যুতি। যাহার যে আশয়, সেই আশয়ে সে যথাযথভাবে অবস্থিতি করিলে, তাহার পরিমাণের তারতম্য ঘটে না. সুতরাং সে অবস্থায় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। লোকালয়ে যেমন প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই রন্ধনালয় বা পাকশালা বিদ্যমান, দেহেও তদ্রূপ পক্বাশয় ও অগ্ন্যাশয় বিদ্যমান। অপিচ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যেমন পাকশালার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, তদ্রূপ উদরের দিকেও দৃষ্টি নিপতিত হয়, বরং প্রথমেই উদরের দিকে দৃষ্টি পড়ে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শরীরের সকল অবয়বে তাপ থাকিলেও কেবলমাত্র পক্বাশয়েই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সুতরাং পক্বাশয়ই অগ্ন্যাশয় বা অগ্নির স্থান। আবার যেমন সজল তণ্ডুল পূর্ণ হাঁড়ী চুল্লীর উপর স্থাপন করিলে, তন্নিম্নস্থ অগ্নিসন্তাপে তণ্ডুল পরিপক্ব হইয়া অন্নে পরিণত হয়, তদ্রূপ আমাশয় বা ষ্টমাকের নিম্নস্থ সমান বায়ুর ধমন ক্রিয়ায়, উদরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া আমাশয়স্থ খাদ্য পাক করে। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্।
ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যস্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলম্॥

এই সমান বায়ুর সমতায় ঔদরাগ্নি সাম্যভাব এবং বৈষম্যাবস্থায় বৈষম্যভাব অবলম্বন করে, আর এই সাম্যাবস্থার নামই সমাগ্নি এবং বৈষম্যাবস্থার নামই অগ্নি বৈষম্য। অগ্নি বৈষম্য ত্রিবিধ—মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বিষমাগ্নি। মন্দাগ্নি—কফ-দুষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নি—পিত্ত-দুষ্ট এবং বিষমাগ্নি—বাত-দুষ্ট। সমান বায়ু কুপিত হইলে অগ্নির সমতা বা সাম্যভাব বিনষ্ট হয় এবং তখন কফের সহিত সংযুক্ত হইলে কফের গুরুতাবশতঃ অগ্নি অধোগামী হয় এবং বাত পিত্ত দুষ্ট হইলে বাত ও পিত্তের লঘুতাবশতঃ অগ্নি ঊর্দ্ধগামী হয়। যে গুণে বমন হয়, তাহাই অগ্নি ও বায়ুর গুণ এবং যে গুণে বিরেচন হয়, তাহাই পৃথিবী এবং জলের গুণ। দেহের বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা যথাক্রমে বায়ুর, অগ্নির এবং জল ও ক্ষিতির পরিণাম বা রূপান্তর। পিত্ত অগ্নির এবং কফ জল ও পৃথিবীর। বমন ও বিরেচন উভয়ই বিকার। বিকৃতির দ্বারা প্রকৃতি নির্ণীতা হয়। যে গুণে বমন ও বিরেচন হয়, সেই গুণে পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং রসরক্তাদি পদার্থ দেহের ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হয়। সুশ্রুতে বলা হইয়াছে—"বমনদ্রব্যাণি অগ্নিবায়ুগুণভূয়িষ্ঠানি, অগ্নী বায়ূ হি লঘূ লঘুত্বাত্তানূর্দ্ধমুত্তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্বমনমপ্যূর্দ্ধ—গুণভূয়িষ্ঠমুক্তং।" বমন দ্রব্য অগ্নি ও বায়ু গুণ বহুল, অগ্নি এবং বায়ু উভয়ই লঘু, লঘুত্ব হেতু তাহারা ঊর্দ্ধগামী হয়। তদ্রূপ—"বিরেচনদ্রব্যাণি পৃথি-

বায়ুগুণভূয়িষ্ঠানি পৃথিব্যাপো গুর্ব্যো গুরুত্বাদধো গচ্ছন্তি, তস্মাদ্বিরেচন মধোগুণভূয়িষ্ঠ মুক্তং। বিরেচন দ্রব্য পৃথিবী ও অম্বুগুণভূয়িষ্ঠ তজ্জন্য বিরেচন অধোগামী। পিত্ত স্বভাবতঃ লঘু এবং শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ গুরু। যে গুণে আকাশ হইতে বৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহাই জলীয়গুণ, এই গুণ দেহের শ্লেষ্মায় বিদ্যমান, আর যে গুণে নদ নদী ও সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহাই সূর্য্যের দহন গুণ, এই গুণ দেহের পিত্তে বিদ্যমান। অথবা জ্বলন গুণবিশিষ্ট প্রজ্বলিত দীপালোকের ঊর্দ্ধগতি পিত্তে এবং তন্নিম্নস্থ তৈলের নিম্ন গতি শ্লেষ্মায় বিদ্যমান, কিন্তু এই ঊর্দ্ধগতি ও নিম্নগতির কারণ সমান বায়ুর বৈষম্য, সমান বায়ু কুপিত হইলে, অগ্নি স্বকীয় আশয়-ভ্রষ্ট হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং ভুক্তান্ন যথারীতি পরিপক্ক হয় না। চরকে ইহার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে :—

যথা প্রজ্বলিতো বহ্নিঃ স্থাল্যামিন্ধনবানপি।
ন পচত্যোদনং সম্যগনিলপ্রেরিতো বহিঃ॥
পক্তিস্থানাত্তথা দোষৈ রুগ্না ক্ষিপ্তো বহির্গ্গতম্
ন পচত্যভ্যবহৃতং কৃচ্ছ্রাৎ গুর্ব্বা বা লঘু॥

যেমন স্থালীস্থ বহ্নি ইন্ধনযুক্ত হইলেও বায়ুদ্বারা বহিঃ প্রেরিত হওয়ায় সম্যক্ অন্নপাক করিতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকলের দ্বারা মানুষের উষ্মা পক্বাশয় হইতে বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আহার পাক করিতে সমর্থ হয় না অথবা কষ্টের সহিত লঘু অন্ন পাক করে। উষ্মা কিরূপে স্থানচ্যুত হয়, সেই তাহার প্রমাণ। জ্বরে যে থার্ম্মমিটারের পারদ [illegible] হয়, তাহা ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন অগ্নি ও বায়ু-গুণেরই ক্রিয়া এবং জ্বরচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে আবার যে ঐ যন্ত্রের পারদ নিম্নগামী হয়, তাহাই শ্লেষ্মার সোম বা শৈত্য-গুণের ক্রিয়া। চরকে জ্বরোৎপত্তির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে —

বিক্ষিপ্যামাশয়োষ্মাণং যস্মাদন্যা রসং নৃণাং।
জ্বরং কুর্ব্বন্তি দোষাস্তু হীয়তেঽগ্নিবলং ততঃ॥

যেহেতু দোষ সকল আমরসকে প্রাপ্ত হইয়া আমাশয়স্থ উষ্মাকে স্থানচ্যুত করিয়া জ্বরোৎপাদন করে, সেইজন্য পাচকাগ্নি বলহীন হয়। যেমন অতি তপ্ত তৈল ও ঘৃতে জল নিপতিত হইলে সেই তৈল ও ঘৃতের উষ্মা বা তাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ আমাশয়স্থ আমরস তন্নিম্নস্থ অগ্ন্যাশয়ে নিপতিত হইলে, সেই রসের চাপে অগ্ন্যাশয়ের উষ্মা উৎক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বতঃ বিস্তৃত হয়, ইহাই জ্বর নামে অভিহিত। তজ্জন্য অগ্ন্যাশয়ের পাচকাগ্নি বলহীন হয়। কেবল জ্বর বলিয়া নহে, পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা হইতে অসংখ্যরোগের সৃষ্টি হয়। চরকে বলা হইয়াছে—

"দ্বে রোগানীকে আশয়ভেদেন আমাশয়সমুত্থঞ্চ পক্বাশয়সমুত্থঞ্চ।"

আশয় ভেদে রোগ দ্বিবিধ, আমাশয়জাত ও পক্বাশয়জাত। আমাদিগের পানাহার মুখবিবর হইতে নিপতিত হইয়া আমাশয় ও পক্বাশয় এই দুই স্থানেই পরিপক্ক হয়, অতএব পানাহারের দোষে যে সকল বিকার জন্মে সেই সকল বিকার আমাশয় ও পক্বাশয় হইতেই জন্মে এবং অগ্নি-বৈষম্যই তাহার কারণ, তবে সকল রোগে অগ্নি সমভাবে দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হয় না এবং সকল রোগের লক্ষণও একবিধ নহে। মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বিষমাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি-বিকার হইতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশ ব্যাধিতেই জ্বর পরীক্ষায় যে

প্রয়োগ করিলে অগ্নির দুর্ব্বলতা প্রতীয়মান হয়। জ্বর-বিচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে যেমন থার্ম্মমিটারের পারদ ৯৪।৯৫ ডিগ্রীতে নামিয়া যায়, তদ্রূপ অনেক রোগেই পারদ নিম্নে নামিয়া যায়, ইহাই অগ্নিহীনতা তথা শ্লেষ্মা বা শ্লেষ্মার সোমগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ। তদ্ব্যতীত ক্ষুধা-হ্রাস, আহারে অনিচ্ছা বা অসমর্থতা কিম্বা আহারের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া অথবা অস্বাভাবিক তাপ, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ প্রভৃতি লক্ষণ অগ্নি দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। তাপই হউক, ভয়ই হউক, ক্রোধই হউক বা বিষাদই হউক অথবা মোহ বা অপ্রসন্নতাই হউক, সকল শরীরেই আছে, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই দোষের এবং তাহাই বিকার শব্দ বাচ্য।

ক্রোধ, ভয়, বিষাদ, অজ্ঞানতা ও অপ্রসন্নতা এ সকল স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক কিম্বা অগ্নিহীনতা হইতে উৎপন্ন কি না, তাহা জানাও কঠিন নহে। অগ্নিহীনতা হইতে জাত ক্রোধ, বিষাদ ও অপ্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ ক্ষণিক, তাহাদিগের স্থায়িত্ব বড় অল্প। যেমন ক্রোধের উদয়, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশান্তি। অগ্নিহীন বা অল্পাগ্নি এঞ্জিন কি অধিকক্ষণ বা অধিক বেগে দৌড়াইতে পারে? ইন্ধন বিহীন বা অল্প কয়লা বিশিষ্ট এঞ্জিন কি অধিক তেজে ছুটিতে পারে? সেইজন্যই আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—

অন্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তি ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতং॥
সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্॥
তদ্ধি তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোষ্মা যঃ স পক্তিমান্
স কায়াগ্নিঃ স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্।
স সঞ্চরতি কুক্ষিস্থঃ সর্ব্বতো ধমনীমুখৈঃ॥

কবিরাজ,
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

আয়ুর্ব্বেদে পরিপাক ক্রিয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহা শ্বেত, পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, ক্ষার ও অগ্নিগুণযুক্ত। এই রসের গুণ ও কার্য্য কতকটা লালার ন্যায়। কিন্তু আমাশয়িক অম্লরসের সহিত ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাশয়িক রস মূলতঃ মধুর রসকে (শর্করাকে অম্লরূপে পরিণত করে এই রস আবার সেই অম্ল রসকে মধুর রসে আনয়ন করে। এবং দেখা যায় যে, ঘটনা ক্রমে গ্রহণী হইতে অতিরিক্ত পিত্ত চালিত হইয়া আমাশয়-গাত্র লিপ্ত করিলে পরিপাকের বিঘ্ন ঘটে। এইরূপ অবস্থায় যে কোন দ্রব্য আহার করিলে, পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া বরং তদ্বিপরীত অজীর্ণ (বিদগ্ধাজীর্ণ) রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই রস সেরূপ নহে, এই রসের সহিত যত অধিক পরিমাণে পিত্ত সংযুক্ত হইবে ততই এই রসের কার্য্য প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। ঠিক এইরূপ অবস্থায় পুনঃ পুনঃ আহার করিয়াও মানব তৃপ্তি বোধ করে না, বরং আরও খাইবার ইচ্ছা হয়, ইহাকেই ভস্মকাগ্নি বলে। গ্রহণীপ্রাপ্ত এই রসের নাম ক্লোমরস। ক্লোমযন্ত্র নাভির উপরিভাগে তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত। ইহা যকৃতের নিম্ন হইতে আরম্ভ

করিয়া প্লীহার সমসূত্রে নাভির উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দাগগুলি দেখিতে অনেকটা "তিলের মত" সুতরাং ইহার অপর নাম "তিল"। যকৃৎ এবং ফুস্ফুসের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা জলবাহি-ধমনীর মূল। এখান হইতে একটী ধমনী উত্থিত হইয়া জলবাহি কৈশিকী সিরাজালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ক্লোমযন্ত্র হইতে একটী ধমনী গ্রহণীর বাঁকের কিঞ্চিৎ নিম্নে উপস্থিত হইয়াছে। এবং তদ্দ্বারা ক্লোমরস গ্রহণীতে পতিত হইয়া পিত্তের সহিত একত্র হইয়াই কটুরস প্রধান ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করে। এবং এই রসের সহিত মিলিত হইলে পুনরায় দ্রব্যগুলি মধুর রসে পরিণত হয়, ইহাই আমাশয়িক শেষ পরিপাক। এই শেষ পরিপাক কালে গ্রহণীগাত্র হইতে আরও বিবিধ প্রকার মধুর রস শ্লৈষ্মিকধাতু লালার ন্যায় নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়।

গ্রহণীর বিস্তৃত বিবরণ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গ্রহণী আমাশয়েরই একটী অংশ এবং বর্ণনার সুবিধার জন্য, "গ্রহণী ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত মিলিত" এ কথাও বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রহণী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। একটী ধমনীই আমাশয় হইতে নির্গত হইয়া পক্বাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমগ্র ধমনীর নাম ক্ষুদ্রান্ত্র। ইহার প্রথম অংশের নাম প্রধানতঃ গ্রহণী, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বাদশ আঙ্গুল। অপর অংশের নাম প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্র কিন্তু সাধারণতঃ এই বিস্তৃত সমগ্র ধমনীর নামই ক্ষুদ্রান্ত্র বা গ্রহণী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে। আমাশয়ের ন্যায় ইহারও তিনটী আবরণ, বাহ্য, মধ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য আবরণ—ইহা ত্বকের ন্যায় অবস্থিত। এই আবরণটী আমাশয়ের ত্বক গাত্র হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—পেশীর আবরণ। ইহাতে কতকগুলি পেশীতন্তু দীর্ঘাকারে সমস্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে বিস্তৃত হইতেছে, এবং কতকগুলি তন্তু বৃত্তাকারভাবে এই ধমনীর সমস্ত পরিধি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই পেশীর আবরণে মাংসধরা কলা দৃষ্ট হয়। এই কলাগাত্রে শোণিতবাহি-সিরা, স্নায়ু সকল অবস্থিতি করে। আভ্যন্তর আবরণ পিত্তধরা কলা। ইহার ত্বক্‌গাত্র পিত্তময় হইলেও শ্লেষ্মা লিপ্ত থাকে, এবং কৈশিকী সিরাগুলি এই স্থানে আসিয়া অবশেষে ছিদ্ররূপে পরিণত হইতেছে। এবং এই সকল স্থান পেলব (কোমল) পেশীতন্তু দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় আভ্যন্তর প্রদেশটী অতিশয় কোমলতা প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্রান্ত্র পিত্তময় ও সমান বায়ুর বিচরণ স্থান বলিয়া, এই স্থান হইতে পরিপাক প্রাপ্ত অন্নের সারভাগ অক্লেশে শোষিত হইতে পারে। এবং ইহাতে শ্লেষ্মা থাকায় এই অন্ত্রে অন্নের গমন এবং পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। পেশীসূত্র বৃত্তাকারে ও দীর্ঘভাবে অবস্থিতি করায় ভুক্তদ্রব্যের দ্রুতগতি নিষেধ হইতেছে। সুতরাং এই ক্ষুদ্রান্ত্রে ভুক্তান্ন সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইতেছে। এবং দেখা যায় যে এই অন্ত্রের প্রথম অংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল, স্থির, বক্র ও অধিক পিত্ত যুক্ত, তৎপর ক্রমে অল্প হইতে অল্পতর হইতেছে। সুতরাং আমরা বর্ণনার সুবিধার জন্য এই প্রথমাংশকে গ্রহণী ও অপরাংশকে উপগ্রহণী

এবং সমস্ত ধমনীকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রহণীতে পরিপাককালে ভুক্তদ্রব্য হইতে যে সারভাগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম রস। এই রস শ্বেতবর্ণ, অতিশয় তনু, শীতল, মধুর রস, স্নিগ্ধ ও গতিশীল। এই রস পরিপাককালে পুনঃ পুনঃ নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে অর্থাৎ বিকৃতি-বিষম-সমবায় বশতঃ মদিরা প্রভৃতির ন্যায়, ভুক্তদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে। এই সময় গ্রহণীস্থিত ভুক্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে গ্রহণীতে পরিপাককালে প্রথম অবস্থায় যে পচ্যমান অন্ন কটুরসে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুনরায় ক্লোম-রস এবং গ্রহণীস্থিত শ্লৈষ্মিক ধাতুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মধুরতা লাভ করিতেছে। তৈল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আমাশয় কিম্বা গ্রহণীতে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু উহারা কৈশিকী সিরাজালে প্রবেশ করিয়া ক্রমে শোণিতবাহি সিরা দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তৈল, জল, সুরা, ভাঙ্গ, অহিফেন প্রভৃতি দ্রব্য, কতকগুলি আমাশয় হইতে এবং কতকগুলি গ্রহণী হইতে অপক্ব অবস্থায় শোণিত-সিরায় প্রবেশ করে। পক্বান্নের সারভাগ, গ্রহণীস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা কৈশিকী সিরায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ-গামী রসবাহিনী ধমনীতে উপনীত হয়। রসবাহিনী ধমনী নাভিদেশ হইতে পশ্চাৎ-ভাগে পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া হৃদয় প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নীল সিরার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ ও এই ধমনী দ্বারা হৃদয় প্রদেশে শোণিত সিরায় পতিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হইতে গ্রহণী হইতে সূক্ষ্মতম স্রোতঃ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে রসের সহিত এবং অবশিষ্টাংশ শোণিত সিরায় প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে সমস্ত ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ এবং জল শোষিত হয়। এবং এই স্থান হইতে পিত্তের কিয়দংশ শোষিত হইয়া নীল সিরায় [illegible] হইতেছে। এইরূপে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ, জল ও পিত্ত শোষিত হইলেও ভুক্তান্ন কঠিনতা প্রাপ্ত বা বিশুষ্ক হয় না, বরং পূর্ব্ববৎ তরলই থাকিয়া যায়। কারণ সমস্ত জলীয় ভাগের শোষণ হয় না, যাহা আবশ্যক তাহাই শোষিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জলীয় ভাগ এবং আমাশয় পরিস্রুত রস, এতদুভয় দ্বারা উহার তরলতা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়। এই ভুক্তান্ন গ্রহণীর মূলভাগ হইতে যত অধিক অগ্রসর হইতে থাকে ততই মধুরতা লাভ করে। কারণ এই যে, গ্রহণী স্থিত কলা যত অধিক পিত্তযুক্ত, উপগ্রহণী সেরূপ নহে। উপগ্রহণীতেও লালার ন্যায় ধাতুস্রাব হইতে দেখা যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নপ্রান্তে একটী কবাট দৃষ্ট হয়। যতক্ষণ ভুক্তদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে অপক্ব অবস্থায় অবস্থিতি করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কবাট বদ্ধ থাকে, এবং পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই ঐ দ্বার খুলিয়া যায় এবং সহজে পক্বান্ন পক্বাশয়ে উপস্থিত হইতে পারে। কবাটের নিকট এই সময় অন্ন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ সমস্তই শোষিত হইয়াছে এবং পক্বান্ন তরল অবস্থায় হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মল পক্বাশয়ে প্রবেশ করে এবং তখন হইতেই মলে দুর্গন্ধ জন্মে। দুর্গন্ধের কারণ কি? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। (ক্রমশঃ)

বলেন পক্কাশয় হইতে এক প্রকার রসের স্রাব হয় এবং তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া মলে দুর্গন্ধ জন্মে। বস্তুতঃ কোন একটী বিশিষ্ট রসের দ্বারাই যে দুর্গন্ধ জন্মে, ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। কিন্তু দ্রব্য, পরিপাক ক্রিয়া, আশয় এবং ইহাদের সংযোগ এই সমস্তই একত্রে দুর্গন্ধের কারণ। ঐ কবাট, ক্ষুদ্রান্ত্র ও পক্কাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে পৃথক করিতেছে। এই কবাট এমন কৌশলে অবস্থিত যে, পক্কাশয় গত দ্রব্য পুনরায় ফিরিয়া পশ্চাৎ ভাগে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কবাটের অংশদ্বয় অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ও পেশী নির্ম্মিত। পেশীতন্তু কতকগুলি বৃত্তাকারে ও কতকগুলি সরলভাবে অবস্থিত থাকায় উহা আরও কঠিন হইয়াছে, উহা পিত্তধরা কলা দ্বারা আচ্ছাদিত। উণ্ডুক যখন মলপূর্ণ থাকে তখন কবাটের অংশদ্বয় এরূপভাবে সংলগ্ন থাকে যে, উণ্ডুক হইতে মল আর ফিরিয়া উপগ্রহণীতে উপস্থিত হইতে পারে না।

পক্কাশয়ের অপর নাম বৃহদন্ত্র। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বৃহদন্ত্র প্রায় ৬৪ হইতে ৯৬ অঙ্গুলী দীর্ঘ। বর্ণনার সুবিধার জন্য ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম উণ্ডুক, দ্বিতীয় পক্কাশয়, তৃতীয় উত্তর গুদ, চতুর্থ অধরগুদ। উণ্ডুকের অপর নাম পুরীষাশ্রয়। ইহা একটী থলার মত, ইহা আন্ত্রিক কবাটের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যোগ রক্ষা করে। পক্কাশয়—বৃহদন্ত্রের প্রায় সমস্ত অংশের নামই পক্কাশয়। ইহা উণ্ডুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া পরে সরলভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া নিম্নগত উত্তর গুদের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই অংশটীর নামই পক্কাশয়। উত্তর গুদ—ইহা অধরগুদেরই একটী অংশ, নলকাকার। অধরগুদ—ইহা নিম্নদেশে বিস্তৃত হইয়া আবার সঙ্কীর্ণ হইয়া মলদ্বারে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ন্যায় বৃহদন্ত্রের তিনটী আবরণ দেখা যায়। বাহ্য আবরণ, পেশীর আবরণ ও আভ্যন্তর আবরণ, বা মলধরা কলা। পেশীর আবরণের কতকগুলি পেশীসূত্র বহির্দেশে লম্বমানভাবে এবং কতকগুলি পেশীসূত্র অভ্যন্তরদিকে বৃত্তাকারভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই পেশীর আবরণ অতিশয় স্থূল, ইহা উপর্য্যুপরি তিনস্তর পেশীসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত। এ স্থানের পেশীসূত্রগুলি কুঞ্চিত হইয়া থাকায়, অধিক মল প্রবেশ করিলেও ইহা বিস্তৃত হইতে পারে। উত্তর গুদ ও অধর গুদের পেশীর আবরণও ঐরূপ স্থূল এবং দ্বিবিধ অর্থাৎ দীর্ঘ ও গোলাকার এবং ঋক্ষ ও কুঞ্চিত পেশীসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত। গুদমার্গ বলয়াকার তিন খানি মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত। বৃহদন্ত্রের তৃতীয় আবরণ মলধরা কলা। ক্ষুদ্রান্ত্রের ন্যায় ইহাতে আগ্নেয়, সারভূত পিত্তাণুগুলি সংলগ্ন থাকে না। এই আবরণ ও তনু ত্বক্ নির্ম্মিত এবং শ্লেষ্মা, সিরা ও স্নায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহাতেও কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এবং তাহারাও কৈশিকী সিরার সহিত যোগ রাখিয়া থাকে। এবং এই সকল কৈশিকী সিরাজাল বঙ্ক্ষণস্থ স্থূল অরুণ সিরার সহিত সংযোজিত। এই শোণিতবাহি কৈশিকী সিরা হইতেই অপান বায়ু পক্কাশয়ে প্রবেশ করে এবং পেটে এক প্রকার বেদনা উপস্থিত করিয়া মল বাহির করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন মলভাগ হইতে ও বায়ুর উৎপত্তি হয়। মল নিষ্কাশন ব্যাপারে বৃহদন্ত্রের কুঞ্চন

ক্রিয়াও সাহায্য করে। বৃহদন্ত্রের পরিপাক শক্তিও কিছু না আছে তাহা নহে, তবে আমাশয় কিম্বা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কারণ পিচ্‌কারী দ্বারা কোন ঔষধ দ্রব্য, পক্বাশয়ে প্রবেশ করাইলেও তাহা পুরীষরূপে পরিণত না হইয়াই নির্গত হইয়া যায়। তবে উহার একটা শক্তি বা বীর্য্য শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা জানা যায় যে পক্বাশয়ের পরিপাক ক্রিয়াও আছে, কিন্তু তাহা ত্বকের ন্যায়। পক্বাশয়ের পরিপাক প্রাপ্ত দ্রব্যের বীর্য্য শোণিত মধ্যেই শোষিত হয়। কিন্তু দ্রবমল সিরাজাল দ্বারা শোষিত হইয়া বস্তিদেশে নীত হয়।

পূর্ব্বোক্তরূপে অপান বায়ুর বেগে ও বৃহদন্ত্রের কুঞ্চনে মল সঞ্চালিত হইয়া উত্তর গুদে উপস্থিত হইলে একেবারে মলদ্বারে আসিয়া পড়ে না, কিন্তু উত্তর গুদে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে। উত্তর গুদের উপরিভাগ বস্তি—গাত্রের সহিত সংলগ্ন। ইহার উপরিভাগ হইতে মল আসিয়া উত্তর গুদে পতিত হইলে দেখা যায়, মল কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ উত্তর গুদে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে অসংখ্য দ্রব মলবাহি সূক্ষ্ম স্রোতঃ বিদ্যমান থাকে। আবার ঐ সকল সিরাজালই বস্তিগাত্রে ব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়।

অতঃপর অপান বায়ুর বেগে মল অধর গুদে উপস্থিত হইয়া নির্গত হইয়া যায়। কুন্থন ক্রিয়া দ্বারা অপান বায়ু উত্তেজিত হইতে পারে। অর্থাৎ নিঃশ্বাস টানিয়া উহা বাহির হইতে না দিয়া নিম্নদিকে চাপ দিলে অপান বায়ুর উপর যে ভাব পতিত হয় তদ্দ্বারা ঐ বায়ু প্রকুপিত হইয়া অন্ত্রে বেদনা উৎপাদন করতঃ মল নিঃসারণ করিয়া থাকে। এবং এই সময় অন্ত্রেরও কুঞ্চন ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ গুদ-মুখ কুঞ্চিত থাকে কিন্তু মল নির্গমন কালে উহা প্রশস্ত হইয়া মল পরিত্যাগ করে। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—

শ্রীহরমোহন মজুমদার।

দীর্ঘজীবীর দিনচর্য্যা।

(১) শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি, এল্, সি, এস, আই।

মনুষ্য প্রকৃতি যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা জানেন যে উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ মানুষের মনের উপরি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কেননা উপদেশ বাঙ্ময়, উদাহরণ শরীরী, উপদেশ কঠোর, উদাহরণ কোমল, উপদেশ আজ্ঞাকারী প্রভু, উদাহরণ হিতকামী সুহৃৎ। পিতার আদেশ পালন করিবে ইহা উপদেশ—রামায়ণ ইহার অপূর্ব্ব হৃদয়ানন্দকর উদাহরণ। ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পতন” উপদেশ মাত্র—মহাভারত ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশদ উদাহরণ। নীতি সম্বন্ধে যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষেও তদ্রূপ—আয়ুর্ব্বেদের স্বস্থবৃত্ত উপদেশ, দীর্ঘজীবী—তাহার উদাহরণ। আয়ুর্ব্বেদ হইতে কেবল আয়ুর্ব্বর্দ্ধক উপদেশ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রচার করা অপেক্ষা এতদ্দেশীয় দীর্ঘজীবিগণের অনুষ্ঠিত আহার, ব্যায়াম ও আচারবিধি পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিলে, অধিক ফললাভের সম্ভাবনা আছে এই চিন্তা করিয়া, আমরা দীর্ঘ-

জীবিগণের দিনচর্য্যা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অধুনা বাঙ্গালীর সাধারণ পরমায়ুর পরিমাণ সম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারা বলেন ৩০ হইতে ৪০ বৎসর আধুনিক বাঙ্গালীর গড় পরমায়ু বলা যাইতে পারে। এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় যাঁহারা ৭০ অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমরা দীর্ঘজীবী বলিব। শিশু পড়িয়া গেলে কি বিষম খাইলে, মাতা "ষাট্ ষাট্" বলেন। ষাট বৎসর বাঁচাই যেন এখন খুব বেশী।

উত্তর পাড়ার সুবিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত **প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়** এম্, এ, বি. এল্, সি, এস্, আই মহোদয় ১২৪৭ সালের ৩রা আশ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক ৭৬ বৎসর। আমি রাজা বাহাদুরের অনুষ্ঠিত দিনচর্য্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম রাজা বাহাদুর তদুত্তরে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছিলেন আমি তাহাই সুবিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি ইহাতে দীর্ঘ জীবনাভিলাষিগণের উপকার হইবে।

পিতা মাতার পবিত্র শরীর ও শাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার, আমার দীর্ঘজীবনের প্রধান কারণ মনে করি।

দন্তধাবন—৪০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কখনও গুল-গুঁড়া কখনও খড়ি মাটীর গুঁড়া দিয়া দন্তধাবন করিতাম। তাহার পর এখন পর্য্যন্ত—মাটী গুঁড়া, সৈন্ধব লবণ, শুঁট, পিপুল, মরিচ, তেজ পাতা, লোধ ও মুথার গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া এই গুঁড়া দিয়া দন্তধাবন করি। এখন পর্য্যন্ত দাঁত ভালই আছে।

তৈলমর্দ্দন—স্থির নিয়ম কিছু নাই—তবে প্রতিদিন তৈল মাখি। বর্ষা ও হেমন্তকালে কুব্জ-প্রসারণী এবং অপর ঋতুতে কটু তৈলে প্রস্তুত সৈন্ধবাদ্য তৈল মাখি। আমি কখনও সাবান ব্যবহার করি না।

স্নান-৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিদিন অবগাহন স্নান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোলাজলে স্নান করিয়া থাকি। শীতকালে —জলে স্নান করি।

আহার—৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেলা ১০ কি ১০॥ টার সময় গৃহস্থ লোকের ন্যায় সাদাসিধে অন্নাহার করিতাম। বেলা ২।৩ টার সময় কচুরি সন্দেশ জল খাবার খাইতাম। রাত্রি ৮টার মধ্যে পুরী খাইতাম। মাসের মধ্যে ৪।৫ দিন ছাগ মাংস ভোজন করি। প্রতি মাসেই এই নিয়ম। মৎস্য ভোজন প্রায় ত্যাগ করিয়াছি। মাসের মধ্যে কখনও এক দিন খাই। গতবৎসর হইতে রাত্রিতে কেবল ২।৩ খানি রুটী কি খৈ খাইতেছি। ফলের মধ্যে বস্তা, পেঁপে; আম্র, লিচু, শাকালু, কচিশশা, বাদাম, কিসমিস, ও পেস্তা সর্ব্বদা খাইয়া থাকি। এসকল আহারের সঙ্গেই খাইয়া থাকি। ২০ বৎসর বয়স হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনের জন্যও উপবাস করিতে হয় নাই। আমার সকল রসের দ্রব্যই ভাল লাগে, তবে মিষ্ট দ্রব্য অধিক খাইতে পারি না। খাইলে অম্ল হয়। প্রাতে ১০½ টার পূর্ব্বে আমি কিছুই খাই না।

পানীয়—বরাবর গঙ্গার জল পরিষ্কার করিয়া পান করিতাম কিন্তু "সেপ্টিক্

টাইফ" হওয়ার পর আর গঙ্গা জল পান করি নাই, পুকুরের জল পান করিতেছি। আমি ১০।১২ বৎসর বয়সের পর কখনও বরফ ব্যবহার করি নাই। কখনও চা পান করি নাই।

নিদ্রা—পরীক্ষা দিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে কেবল ৫ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতাম। মনে করিতাম যাহারা মনের সাধে নিদ্রা যাইতে পারে তাহারা কি সুখী। অপর সময় ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতাম। ৩০ বৎসর হইতে রাত্রি ৩ টার সময় শয্যাত্যাগ করার নিয়ম করিয়াছি। ৫০ বৎসরের পর দিবানিদ্রা অভ্যাস হইয়াছে। কিন্তু আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার অধিক নহে।

শয়নগৃহ ও শয্যা—সমস্ত বৎসর আমার শয়ন গৃহের ১টী কি ২টী জানালা খোলা থাকে। গ্রীষ্মকালে সমস্ত জানালা খোলা থাকে। শীতকালে লেপ দিয়া মুখ কখনই ঢাকিতে পারি না। কখনও গদি-কেদারায় বসি নাই। ৬।৭ বৎসর বয়সের পর কখনও গদিশয্যায় শয়ন করি নাই। ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে কখনও মশারি ব্যবহার করি নাই।

পরিচ্ছদ—শীত, গ্রীষ্ম দুই কালেই আমি শীত ও গ্রীষ্ম সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী অনুভব করি। তজ্জন্য শীতকালে গায়ের উপরে ফ্লানেল জামা অথবা উলের গেঞ্জী ২।৩ মাস পরিয়া থাকি। আমি সাদাসিধা পরিচ্ছদের পক্ষপাতী। ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে কখনও ছাতি ব্যবহার করি নাই।

ব্যায়াম—৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুই বেলা অশ্বারোহণ করিতাম। সংপ্রতি প্রাতে ও অপরাহ্নে আধ ঘণ্টা করিয়া গাড়ীতে বেড়াই।

বিষয়কর্ম্ম ও অধ্যয়ন—স্নান আহারের সময় বাদে সকল সময় বিষয়-কর্ম্ম কিম্বা পুস্তক পাঠ করি। শরীর সুস্থ রাখিবার নিয়ম ১৬।১৭ বৎসর হইতে এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পাঠ করি ও ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করি। মানসিক অথবা শারীরিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকি। সকল বিষয়েরই পুস্তক পড়িয়া থাকি, তবে গত ২।৩ বৎসর মধ্যে শরীর ও চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকই অধিক পড়িতেছি। ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পড়াশুনায় তাচ্ছিল্য করিতাম। তাহার পর স্কুল ও কালেজের পড়ার উপর ২।৩ ঘণ্টা মাত্র পড়িতাম। কিন্তু পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে ২।৩ মাস ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টা পড়িতাম। শেষ রাত্রিতে ৩টার সময় উঠিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত লেখা পড়ার কার্য্য করিতাম। প্রায় ৫।৬ মাস হইতে সেজের আলোকে চক্ষুর দৃষ্টির হানি হইবার আশঙ্কায় বিছানায় শুইয়া থাকি। ৪টার পর উঠি—শেষ রাত্রিতে আমার ইংরাজি চিঠি পত্র ও অপর কাজ করি। অধিক কাজ না থাকিলে পুস্তক পাঠ করি।

ঔষধ—২০ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ও পরে আবশ্যক হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করিতাম। গত ১০।১২ বৎসর হোমিওপ্যাথি ঔষধ ভিন্ন কবিরাজী ঔষধও খাইতেছি। প্রতি বৎসর ৩০।৪০ দিন ছাগলাদ্য ঘৃত ১ তোলা কি ১½ তোলা সেবন করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাতে ১০॥০ টার পূর্ব্বে কিছু খাই না, কিন্তু যখন ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করি তখন প্রাতে ঘৃতের সহিত অর্দ্ধপোয়া গব্য দুগ্ধ পান করিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতে কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। প্রথম

বয়সে তজ্জন্য হল্ওয়ের পিল ২।৩ বৎসর খাইয়াছিলাম। তারপর ৫।৭ বৎসর কোন রেচক ঔষধ খাই নাই। এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর হইল "ঋতুহরীতকী" খাইতেছি। চক্ষু-রোগাধিকারের যে ভৃঙ্গরাজ তৈল আছে, ১০।১২ বৎসর হইতে প্রতি সপ্তাহে ৩।৪ দিন ঐ তৈলের নস্য লইয়া থাকি। অধিক লেখা পড়ার পর চক্ষুর কষ্ট হইলে নির্ম্মলী ফল মধুতে ঘসিয়া চক্ষুতে দিয়া থাকি। এমনিও প্রায়ই চক্ষুতে দিয়া থাকি।

বিশেষ অভ্যাস—চুরুট ছাড়িবার জন্য সাজা তামাক ২।১ দিন খাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু "তলব" নাই বলিয়া তাহা অভ্যস্ত হয় নাই। যতক্ষণ কাজে থাকি ততক্ষণ ঘরের ভিতর থাকি। বাকি সময় বারাণ্ডায় বা ফাঁকা জায়গায় থাকিতে ও বসিয়া পড়িতে ভালবাসি। প্রতিদিন প্রাতে ৪।৫টার সময় উপস্থতে জল দিয়া থাকি।

শ্রম-বিনোদন—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া অবসর যাপন করি ও তাহাদিগকে সমবয়স্কের ন্যায় দেখি।

নীতি—মন ভাল না রাখিলে শরীর ভাল থাকে না। পিতার উপদেশ ও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে সাংসারিক ঘটনায় অধিক আনন্দ বা দুঃখ করি না। কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করি কিন্তু তাহা বিফল হইলে মনকে কষ্ট দিই না। সাংসারিক ঘটনা সকল আমাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিয়া থাকে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া মনকে সর্ব্বদা সুখে রাখি। কাহার ও সুখে হিংসা করি না এবং দুঃখে আনন্দ করিনা।

ধর্ম্মাচরণ—জীবনের সমস্ত কার্য্যেই ধর্ম্মানুশীলন করিয়া থাকি—প্রকাশ্য আহ্নিক কার্য্যে অতি সামান্য সময় ক্ষেপণ করি।

আমার বাতপৈত্তিকের ধাত। তবে প্রায় একবৎসর দেড় বৎসর হইতে দেখিতেছি পূর্ব্বাপেক্ষা মধ্যে মধ্যে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পীড়ার হেতু—যে কোন শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি আমার বিশ্বাস তাহার কারণ ২২ বৎসর বয়স হইতে এপর্য্যন্ত চুরুট খাওয়া এবং ঔষধের প্রতি অধিক নির্ভর করিয়া মধ্যে মধ্যে অতি ভোজন।

আমরা অল্পায়ু হইতেছি কেন ?

আমরা অল্পায়ু হইতেছি কেন ? বিচার করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে, আয়ু সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে একটী বিষম ভ্রম আছে তাহা অপনোদন করা উচিত। আয়ুঃশব্দের অর্থ জীবিতকাল অর্থাৎ যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকি সেই কালকে আয়ু বলে। আমাদের জীবিতকালের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। মনে করিলে—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া চলিলে, আমরা আমাদের জীবিতকাল সুদীর্ঘ করিতে পারি—আমরা দীর্ঘজীবী হইতে পারি। আবার অত্যাচার করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মের অবমাননা করিলে, আমরা জীবিতকালকে অতি হ্রস্ব করিতে পারি—আমরা নিতান্ত অল্পায়ু হইতে পারি। লোকের কিন্তু ধারণা, মানুষ একটী নির্দ্দিষ্ট আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের বিশ্বাস অমুক এতদিন বাঁচিবে

অর্থাৎ অমুকের আয়ু তাহার জন্মের সহিত ঠিক হইয়া গিয়াছে—তা সে হাজার নিয়ম পালন করুক বা সহস্র অনিয়ম করুক তাহার জীবিতকাল তাহাতে বৃদ্ধিও হইবে না হ্রাসও পাইবে না—সে যত আয়ু লইয়া আসিয়াছে ততদিন তাহাকে কে মারে। জীবিতকাল সম্বন্ধে যাহাদের এইরূপ স্থির ধারণা আছে তাহারা যে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন উপেক্ষা করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? ইহাদের নিকট যদি কেহ বলেন "অমুক ঘোর অজিতেন্দ্রিয়—নানা অত্যাচার করিয়া মারা গেল"—উহারা অমনি বলিবে "উহার আয়ু ছিল না তাই মারা গেল।" এই নিয়ত-আয়ুবাদিগণের ভ্রম নিরাশ জন্য আমরা কিছু বলিব না। আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষি আয়ু সম্বন্ধে শিষ্যের সন্দেহ নিরাশ জন্য যাহা বলিয়াছেন আমরা নিম্নে বঙ্গভাষায় তাহারই অনুবাদ প্রকাশ করিলাম—

"আয়ুর পরিমাণ যদি বিধাতাকর্ত্তৃক নিরূপিতই থাকিত তাহা হইলে দীর্ঘায়ুলাভ করিবার জন্য মন্ত্র, ওষধি, মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাতাদি কেন? উদ্‌ভ্রান্ত, চণ্ড, চপল, গো, গজ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব, মহিষাদি এবং দুষ্ট বাত্যাদি পরীহার করিয়া চলিবারই বা প্রয়োজন কি? পর্ব্বত হইতে পতন, গিরি সঙ্কট, দুর্গমস্থান, জলস্রোতঃ, প্রমত্ত, উন্মত্ত, মোহ-লোভাকুলমতি শত্রুগণ, প্রবল অগ্নি ও বিষধর সর্পাদি হইতে আত্মরক্ষারই বা আবশ্যকতা কি? আয়ুর পরিমাণ যদি নির্দ্দিষ্টই থাকিত তাহা হইলে দুঃসাহস, রাজকোপ প্রভৃতি আয়ুনাশ করিতে পারিত না। আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সহস্র পুরুষের মধ্যে যাহারা সর্ব্বদা যুদ্ধ করে এবং যাহারা না করে, তাহাদের আয়ু সমান নহে। আমরা দেখিতেছি যে জন্মমাত্র প্রতীকার ও অপ্রতিকার হেতু মানুষের আয়ুর অতুল্যতা রহিয়াছে (যেমন, যদি কোন শিশুর নাড়ীচ্ছেদে ব্যতিক্রম ঘটে তবে তাহার প্রতিকারে শিশুর জীবনরক্ষা ও অপ্রতিকারে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে)। যে বিষপান করে ও যে বিষপান করে না এই দুই জনের আয়ুর অতুল্যতা দেখা যায়। জলপানের কলসী অপেক্ষা চিত্রঘট অর্থাৎ চিত্রিত তোলা কলসী, অধিক কাল-স্থায়ী হয়। যখন আমরা বুঝিতেছি বলিতেছি ও দেখিতেছি যে দেশ, কাল ও সাত্ম্যের বিপরীত আহার বিহারে আয়ুর হানি এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিপূর্ব্বক আহার বিহারে আয়ুবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, হিতাচার-মূল আয়ু। গুরুর এই কথা শুনিয়া শিষ্য বলিলেন—ভগবন্ যদি আয়ুর পরিমাণ বিধিনির্দ্দিষ্ট না হইল তবে কালমৃত্যু অকালমৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? এতদুত্তরে গুরু বলিতেছেন—একটী শকটের বিষয় চিন্তা কর—যদি শকটটী উত্তম সারবান্ কাষ্ঠে সুনিপুণ কারিকর কর্ত্তৃক সুগঠিত হয়, বলিষ্ঠ, শান্ত অশ্বে শকট বহন করে, সুনিপুণ সারথী শকট পরিচালন করে, সমতল রাজমার্গে বাহিত হয়, যথাকালে শকটচক্রে স্নেহাদি প্রদত্ত হয় এবং পরিমিত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তথাপি চক্রমণ্ডলের স্বপ্রমাণ-ক্ষয়হেতু এক দিন উহা বিনষ্ট হইবে। এইরূপ মানুষের দেহরথ যথাশাস্ত্র আহার বিহার অনুসারে পরিচালিত হইলেও একদিন উহা অচল হইবে। ইহাকেই কাল-মৃত্যু বলে। আর উক্ত শকটীর উপাদান যদি অসার হয়, গঠন যদি সুসংশ্লিষ্ট না

হয়, যদি দুষ্ট অশ্ব কর্ত্তৃক উচ্চনীচ মার্গে, অনিপুণ সারথী দ্বারা অতি ভারযুক্ত হইয়া পরিচালিত হয়, যদি অভিঘাত হেতু চক্রাঙ্গের হানি হয়, তাহা হইলে শকটটী যেমন অকালে বিপন্ন হইয়া থাকে, মানুষের শরীরও সেইরূপ বলের অতিরিক্ত চেষ্টা, অগ্নির অতিরিক্ত ভোজন, অতিমৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বিষবহ্নির উপতাপ, অভিঘাত ও উপবাসাদিহেতু মধ্যকালেই অন্তিমদশায় উপনীত হয়। ইহারই নাম অকালমৃত্যু"। (চরক-বিমান ২য় অধ্যায়)

উপরি উদ্ধৃত ঋষিবাক্যের সারমর্ম্ম এই—মানুষের কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ু নাই—হিতাচার পালন কর, আয়ু রক্ষিত হইবে, অহিতাচার কর, আয়ু ক্ষয় হইবে। অতঃপরও যদি নিয়ত-আয়ুবাদিগণের ভ্রম নিরাশ না হয়, তাঁহারা যদি হিতাচারের—স্বাস্থ্যরক্ষাকর নিয়মের উপকারিতায় দৃঢ় প্রত্যয় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এবং সমাজের দুরদৃষ্ট বুঝিতে হইবে। ইহাও বুঝিব যে, আর ঋষিবাক্যেও লোকের শ্রদ্ধা নাই।

সুবুদ্ধি পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, আয়ু বাড়ানর ও কমানর উপায় আমাদের হাতেই রহিয়াছে। কাহার ইচ্ছা নয় যে, আমি সুস্থ শরীরে থাকি? কে ইচ্ছা করেন না যে, আমার আয়ু শতবর্ষ পরিমিত হউক? অব্যাহত স্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ আয়ু যখন সকলেরই ঈপ্সিত এবং আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধির উপায় যখন আমাদেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত তখন আমাদের অল্পায়ু হওয়ার কারণ কি?

প্রথম কারণ—শিক্ষাভাব—আচার-ভ্রংশ। অধুনা আমাদের দেশে পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালায় স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তক বালকদিগকে পড়ান হইতেছে—তবে শিক্ষাভাব কেমন করিয়া বলা যায়? স্বাস্থ্যরক্ষার পুঁথি আবৃত্তি করাকে আমরা শিক্ষা বলিব না। যোগ্যাকরণ (Experiment) যেমন বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রাণ, আচার অনুষ্ঠান তেমনি স্বস্থবৃত্তের প্রাণ। আচারভ্রষ্ট হইয়া আমরা যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আবৃত্তি করি, তাহা হইলে এই প্রাণহীন শিক্ষাকে শিক্ষাভাব বলায় দোষ কি? চারিদিকে কলেরা হইতেছে গুরুমহাশয় "সরলশরীরপালনের" নজির দিয়া উপদেশ দিলেন দেখ, তোমরা কেহ এখন কাঁচা ফল খাইও না। ছাত্র দেখিল গুরুমহাশয় স্বয়ং বাড়ী গিয়া পেয়ারা ও শশা খাইতেছেন। ছেলে পাঠশালায় পড়িয়া আসিল "প্রাতঃকালে দন্তধাবনের পূর্ব্বে কিছু ভক্ষণ করা উচিত নহে।" বাড়ীতে কিন্তু সে রোজ দেখে, বাবা বিছানা হইতে উঠিয়া কাছা দিতেও ত্বরা সহে না, আগে চা খান। আপনারা বলুন দেখি এস্থলে বালক গুরুমহাশয় ও পিতার আচরণের অনুকরণ করিবে কি পুঁথির মতে চলিবে? পূর্ব্বে এদেশের পাঠশালায় "শরীরপালন" পড়ান না হইলেও আচরণ করিয়া গৃহে গৃহে শরীরপালন শিক্ষা দেওয়া হইত। এই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। তোমরা আগে নিজে সদ্‌বৃত্ত, সদাচার অনুষ্ঠান কর, পরে শিক্ষা দাও, যে শিক্ষা ফলবতী হইবে। নচেৎ মদ্যপায়ীর পানত্যাগের উপদেশ কেহ শুনিবে না। একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল—একজনের ছেলে বড়ই মিষ্ট-প্রিয় ছিল। পিতা বিরক্ত হইয়া চিন্তা করিত, কিসে ছেলের এ অভ্যাস ছাড়ান যায়। একদিন পিতা পুত্রকে এক সাধুর নিকট লইয়া গেল—সাধু বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ, যাহাকে কৃপা করিয়া যাহা বলেন ঠিক ফলে। লোকটী সাধুকে বলিল, কৃপা করিয়া

আমার ছেলেটির অতিরিক্ত মিষ্ট খাওয়ার অভ্যাসটী ছাড়াইয়া দেন। সাধু বলিলেন, সাত দিন পরে বালককে লইয়া আসিও। সাত দিন পরে লোকটী ছেলে লইয়া আবার সাধুর নিকট উপস্থিত হইল। সাধু কেবল ছেলেটার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন "বেটা, মিঠা মৎ খানা" সেই হইতে বালক মিষ্ট খাওয়া পরিত্যাগ করিল। বালকের পিতা আবার সাধুর কাছে গিয়া বলিল "দেখুন আমার একটী সন্দেহ আছে, দয়া করিয়া ভঞ্জন করুন" সাধু বলিলেন, কি সন্দেহ বল। সে বলিল আচ্ছা আমাকে সাতদিন পরে আসিতে বলিলেন কেন? আপনি ত সেই দিনই "বেটা মিঠা মৎ খানা" এই কথা বলিতে পারিতেন। সাধু বলিলেন "দেখ আমি নিজে তখন মিষ্ট খাইতাম, তাই তখন ঐ কথা বলি নাই, সাত দিন আমি মিষ্টভোজন পরিত্যাগ করিয়া তবে ঐ কথা বলিতে পারিয়াছি এবং তোমার ছেলেও আমার কথা শুনিয়াছে"। আমাদের দেশের উপদেষ্টারা কবে এই কথার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? আজ কাল বিদেশ হইতে বিবিধ অশন বসনের আমদানী হইতেছে. লোকে শিক্ষার অভাবে, সে গুলি হিতকর কি অহিতকর বিবেচনা করিতে না পারিয়া, মূঢ়ের ন্যায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া যাহা পাইতেছে তাহাই গলাধঃকরণ করিতেছে। যাহা সম্মুখে দেখিতেছে তাহাতেই অঙ্গ ভূষিত করিতেছে। কত উদাহরণ দিব? ধরুন বিলাতী জমাট দুধ ও বিবিধ ফুড, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কে না ব্যবহার করিতেছে? যে দেশ গোধন ও ধান্য-ধনে ভরা ছিল সেই দেশের শিশুগণ আজ দেশান্তর হইতে আনীত পর্য্যুষিত দুগ্ধে পালিত হইতেছে। অহো দশাবিপর্য্যয়! এ সকল খাদ্য না বিষ? বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ স্বার্থের জন্য ঐ সকল দ্রব্যের গুণোদ্ঘোষণ করিতেছে মাত্র। যে দেশের বিলাসপ্রিয়া রমণীগণ সৌন্দর্য্য হানির আশঙ্কায় সন্তানকে স্তন্যদানে পরাঙ্মুখী হয়, সে দেশেই উহাদের প্রচার হউক, ভারতে এ সকল চালাইও না। পরিচ্ছদের কথা কিঞ্চিৎ বলি—বিদেশ হইতে রাশি রাশি পুরাণ জামা, কোট এদেশে আসিতেছে। এই সকল জামা কোথা হইতে আসিতেছে? এগুলি কাহাদের পরিধৃত? এ সকল তত্ত্ব না জানিয়া এদেশের লোকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া আগ্রহের সহিত মূল্য দিয়া ঐ সকল পুরাণ, অন্যের ব্যবহৃত জামা ক্রয় করিয়া পরিতেছে। আর কত দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি এতদ্দেশে বিস্তার করিতেছে। যে দেশের প্রথা, পিতার গামছা পুত্র ব্যবহার করিবে না, সে দেশের এই দুরবস্থা! এই সকল আয়ুঃক্ষয়কর অনর্থ-পরম্পরা হইতে দেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার কি কেহ নাই?

দ্বিতীয় কারণ—প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধ কি? প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান যাহা করিতে বলে তাহা না করিলে জ্ঞানের নিকট যে অপরাধ করা হয় তাহাই প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধের তিনটী অবস্থা; প্রথম—"জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানা মহিতানাং নিষেবণম্।" অর্থাৎ নিজেই বেশ বুঝিতেছি যে, এইরূপ আহার বিহার শরীরের পক্ষে কদাপি হিতকর নহে। তথাপি জানিয়া শুনিয়া প্রজ্ঞার কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক না মানিয়া সেই অহিত আহার বিহার করিতেছি। দ্বিতীয় অবস্থা—

"বুদ্ধ্যা বিষম-বিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়ান্মনসো গোচরং হি তৎ॥

প্রজ্ঞা, যথাযথ বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছে "ইহা করিও না, ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিত" কিন্তু আমি প্রজ্ঞার কথা না শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক উল্টা বুঝিয়া, অহিতকে হিতকর ও হিতকরকে অহিত ভাবিয়া আচরণ করিতেছি। ইহার পর এমন এক অবস্থা আসিয়া পড়ে যখন প্রজ্ঞার বাণী শুনিবার আর শক্তি থাকে না। এই অবস্থায় "ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্ট" হইয়া অর্থাৎ হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া লোক যে অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ইহাই প্রজ্ঞাপরাধের তৃতীয় অবস্থা। প্রতি অবস্থার উদাহরণ দিতেছি। আমি বেশ জানি প্রাতরুত্থান স্বাস্থ্যের হিতকর, তথাপি জানিয়া শুনিয়াও আমি বেলা ৮টা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া থাকি। আমি জানি, বায়ুপ্রবাহহীন বহুজনাকীর্ণ স্থানে রাত্রিজাগরণ অধিক অহিতকর, জানিয়াও আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখিতে ছাড়ি না। আমি জানি চা পান করিলে আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হয়. তথাপি লোকের দেখা দেখি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চা খাইতেছি। প্রজ্ঞাপরাধের এই এক অবস্থা। আমি জানি পাশ্চাত্য জাতির অভ্যস্ত খাদ্য আমার জাতিসাত্ম্য নহে বলিয়া কিম্বা দেশান্তর হইতে আগত টীনবদ্ধ বিবিধ বস্তু পর্য্যুষিত, বলিয়া আমার শরীর ও মনের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না, তথাপি আমি বিপরীত ভাবে চিন্তা করিয়া কোথাও বা কষ্টসৃষ্ট্যা এক আধটা অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, যে ভক্ষ্য বস্তুতঃ অহিতকর তাহাকেই হিতকর ভাবিয়া স্বচ্ছন্দে সেবন করিতেছি। আমি দেখিতেছি বুঝিতেছি যে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে সাহেবদের মত আঁটাসাঁটা পোষাক আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, তথাপি আমি দশ জনের দেখাদেখি বিষম-জ্ঞানে অহিতকে হিতকর ভাবিয়া তদনুসারে আচরণ করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতেছি। প্রজ্ঞাপরাধের চরম অবস্থায় লোক মূঢ়ের ন্যায়, পর প্রেরিতের ন্যায়, সর্ব্বথা হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া, অশুভানুষ্ঠান করে, কাব্যে ও সমাজে ইহার ভূরিভূরি উদাহরণ আছে।

তৃতীয় কারণ—উপকরণাভাব—দারিদ্র্য। নির্ম্মল পানীয়, বিশুদ্ধ পুষ্টিজনক খাদ্য, ঋতু উপযোগী বস্ত্রাদি, সুখকর বাসভবন, পরিমিত শ্রম, সেবাতৎপর ভৃত্য, রোগে চিকিৎসক, পথ্য, ঔষধ এইগুলি আয়ুরক্ষার সংক্ষিপ্ত উপকরণ। এই উপকরণগুলি অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিতে হইলেও আমরা অর্থাভাব শব্দ ব্যবহার না করিয়া উপকরণাভাব শব্দই প্রয়োগ করিলাম, কারণ সংসারে অনেকস্থলে অর্থের সদ্ভাব থাকিলেও উপকরণের অভাব দেখিতে পাই। যে ধনদ্বারা মানুষ আয়ুরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া আত্মবঞ্চনা করে, স্বাস্থ্যচিন্তকগণ সেই ধনরাশিকে পাংশুরাশির মধ্যে গণনা করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ধনাভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। আচার্য্য বলিয়াছেন, অগ্রে কিসে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল বাঁচিতে পার সেই চিন্তা করিবে। তারপর কিসে ধনার্জ্জন করিতে পার সেই চিন্তা করিবে। উপকরণ বিহীন লোকের দীর্ঘ আয়ুর মত কষ্টকর আর কিছুই নাই। সেকাল অপেক্ষা একালে আয়ুরক্ষার উপকরণের সংখ্যা এবং মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং অধুনা ঐসকল উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য লোককে অধিক শ্রম করিতে হইতেছে। দেশে কৃষি

ও বাণিজ্যের তাদৃশ প্রসার না থাকায় বহু-সংখ্যক লোকেই চাকুরীজীবী হইয়াছে। একে তাহাদিগকে অত্যধিক শ্রম করিতে হইতেছে, তাহাতে আবার পরের হুকুমে কাজ করিতে হইতেছে। এই হুকুমই তাহাদের আয়ুঃক্ষয়ের যথেষ্ট কারণ। আমাদের দেশের সরকারী আফিস আদালত, কারখানা, সওদাগরী কার্য্যালয় সকলেরই কার্য্যকাল মধ্যাহ্ন সময়ে। এ দেশে এক প্রহরের মধ্যে আহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে, আবার দুই প্রহর অতীত হইলে আহার করাও উচিতনহে। কিন্তু দেশের লোকের কার্য্যকালের এমনই ব্যবস্থা যে, যথাকালে কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে, লোককে বাধ্য হইয়া এক প্রহরের বহু পূর্ব্বে, যাঁহারা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সূর্য্যোদয়ের অল্প-পরেই আহার করিতে হয়। তারপর গ্রীষ্ম প্রধানদেশে আহারের পর গুরুতর চিন্তা ও শ্রম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর না হইলেও, দেশের জজ-দিগকে আহারান্তেই বিচার করিতে হইতেছে। দেশের কেরাণীদিগকে আহারান্তেই লেখনী চালনা করিতে হইতেছে এবং দেশের হিসাব-রক্ষকগণ আহারান্তেই জমা খরচ লইয়া মাথা কুটিতেছেন। আহারান্তেই শিক্ষক পড়াইতে ছেন, ছাত্রও প'ড়িতেছে,—আর অগ্নিমান্দ্য বহুমূত্র, শিরোরোগ দল বাঁধিয়া আসিতেছে। আহারের পর মানসিক শ্রম করিবার প্রথা আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। এদেশের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা প্রাতেই হইত, এদেশের রাজদরবার প্রাতঃকালেই বসিত। সুতরাং দেখা গেল আয়ুরক্ষার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া লোকে আয়ু হারাইতে বসিয়াছে। অহো কি বিধি বিড়ম্বনা! কেবল কি আহারের পরই মানসিক শ্রম? আমি ত দেখিতেছি আজকাল দেশের অধিকাংশ লোকেই বাধ্য হইয়া অধ্যশন ও বিষমাশন করিতেছে। অধ্যশন ও বিষমাশন কি? যাহা ভোজন করা হইয়াছে তাহা সম্যক্ পরি-পাক পাইয়া ক্ষুধার উদ্রেকের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার ভোজন করাকে অধ্যশন বলে এবং অধিক মাত্রায় ভোজন, অল্পপরিমাণে ভোজন কিম্বা অকালে ভোজনকে বিষমাশন বলে। আজ-কাল জীবিকার জন্য অনেকেই বেলা ৪।৫ দণ্ডের মধ্যেই মধ্যাহ্নের ভোজন শেষ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় কি ক্ষুধা হয়? বহু-লোককে বলিতে শুনিয়াছি, ঘড়িই আমাদিগকে আহার করিতে বলে, ক্ষুধার তাড়নায় খাওয়া কেমন তাহা অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছি। ইহা অধ্যশন নয় ত কি? আহারের সময়েরও স্থিরতা নাই। একই লোক পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যা-লয়ের সময়ানুসারে, চাকুরে হইয়া চাকরীর অবস্থানুসারে এবং কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া নূতন অভ্যাস অনুসারে আহারের সময় স্থির করিতে বাধ্য হয়—বহু ভোজন এবং অল্প ভোজন ত অকাল ভোজনের সহচর, সুতরাং বিষমাশনের আর বাকী রহিল কি? এই দেশব্যাপী অধ্যশন ও বিষমাশনের ফলে অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল, যকৃৎদোষ, অনিদ্রা, বহুমূত্র, ক্ষয়, শিরোরোগ দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া আবালবৃদ্ধকে আক্রমণ করিতেছে। কথিত আছে "মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ" আহার করিয়াই দ্রুত হাঁটিলে মৃত্যুও তাঁহার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। সমাজের অধিকাংশলোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন দেখি অধুনা আহারান্তে কাহাকে না দ্রুত হাঁটিতে হয়? এত হাঁটাহাঁটি সমস্তই উপকরণ সংগ্রহ জন্য

সুতরাং উপকরণাভাব প্রস্তাবে আমরা এ সকল কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

চতুর্থ কারণ।—বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ের অভাব। বণিকগণের মধ্যে ধর্ম্মভীরুতা হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে। বণিকগণ ধনতৃষ্ণার ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অর্থকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় বাণিজ্যক্ষেত্রে ঘোরতর প্রতারণার সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য দুর্লভ হইয়াছে। এখন মাখমে কলাবাটা; ঘৃতে সর্পের চর্ব্বি; সর্ষপ-তৈলে বিবিধ অপেয় স্নেহ; দুগ্ধে খড়ি মাটি, বাতাসা পচাপুকুরের জল; তামাকে চুণ, চটছেঁড়া পচা কাঁটাল; চিনি ও ময়দায় পাথরের গুঁড়া; আরও কত বীভৎস ব্যাপার ঘটিতেছে আমরা সে সকলের সংবাদ জানি না। দেশে আছে সব কিন্তু ফলের পক্ষে ভুয়া। খাদ্যে ভেজাল নিবারণের আইন আছে, কিন্তু লোকে আইনের কাটানও শিখিয়াছে। তোমার আমার যে দুঃখ সেই দুঃখ। কেবল কি খাদ্য? ঔষধ বিক্রেতারা বিদেশী দ্রব্যকে দেশী নামে, অজারিত কে সুজারিত বলিয়া, রহিমকে রাম বলিয়া চালাইয়া, দেশের লোকের স্বাস্থ্যহরণ করিতেছে। সুগন্ধি দ্রব্যের বণিক্ অটোকে অগুরু বলিয়া, ড্যাফোডিল্‌কে গন্ধরাজ বলিয়া চালাইতেছে। উগ্রবীর্য্য বিদেশীয় এসেন্স দেশীয় তৈলে মিশাইয়া বিবিধ বিচিত্র নামে বিক্রয় করিতেছে, আর অকালে খালিত্য পালিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। যেদিকে দেখি সেই দিকেই মেকির চক্ৰ ভেজালের প্রচার।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের কথা আর কি বলিব, আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি যে বিশুদ্ধ জলের অভাবে পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে—ম্যালেরিয়া, কলেরা, অজীর্ণাদি বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় বর্ষে বর্ষে কত লোকের আয়ুক্ষয় হইতেছে।

অতঃপর আমরা সর্ব্বকারণ-সংগ্রাহক অধর্ম্ম ও অসংযমের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে, দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে হইলে, কেবল শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না—মনের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইবে। মন সুস্থ না থাকিলে সুস্থ বলা যায় না। মন প্রফুল্ল না থাকিলে, সর্ব্বদা চিন্তাকুল চিত্তে কালযাপন করিলে, মানুষ সুস্থ থাকিতে পারেনা, দীর্ঘায়ু লাভ ত দূরের কথা। সমাজে অধর্ম্ম এবং অসংযমের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় লোকের চিত্তের সুখ দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং চিত্তের অপ্রসন্নতা, চিন্তাকুলতার জন্য যে সকল রোগ জন্মিয়া থাকে, দেশের লোকের সেই সকল রোগের আধিক্য দেখা যাইতেছে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের কথা, আয়ুর কথা চিন্তা করিলে আকুল হইতে হয়। আশা করি ভগবান্ আবার সেই সুখের দিন ফিরাইয়া আনিবেন যখন দেশের লোকের—

"নগরী নগরস্যেব রথস্যেব যথা রথী।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষবহিতোভবেৎ" ॥

এই ঋষি বাক্যানুসারে কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি জন্মিবে।

শিশু-যকৃৎ-চিকিৎসা।

মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লী। কি রকম ধরা কাটা ?

ঠা। দু বেলা ঝোল ভাত খাবে। ভাজা পোড়া, লঙ্কার ঝাল, দই, অম্বল, মাংস একেবারে খাবে না। দাল, গরম মসলা ঘিয়ের জিনিষ না খাওয়াই ভাল। যাতে গরহজম না হয় এমনভাবে খাবে।

লী। আমাকেও তা হলে রোগী করে তুল্‌লে দেখ্‌চি ঠাকুমা।

ঠা। তা দায়ে পড়েছ রোগী হতে হবে বৈ কি। রোগী হতে অসাধ থাকলে সেটা গোড়ায় ভাব্‌তে হয়।

লী। বেশ রোগীই না হয় হলাম তার পর কি করতে হবে বল।

ঠা। মনে যখন দুঃখ কষ্ট হবে, কি রাগ হবে তখন ছেলেকে মাই দিবিনে। মন বেশ ভাল হলে তবে মাই দিবি।

লী। কেন তাতে কি হয় ?

ঠা। মনে দুঃখ কষ্ট রাগ হলে শরীর খারাপ হয়, মাইয়ের দুধও খারাপ হয়। আর সেই দুধ খেলে ছেলে পিলের অসুখ হয়।

লী। বাবা, এতও তুমি জান ঠাকুমা। তারপর কি বল।

ঠা। বলি শোন। শোক, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি কারণে মন অভিতপ্ত হলে সে সময়ে মাইয়ের দুধ একটু বিকৃত হয়। সেই জন্যে সে সময়ে মাই দিতে নেই। মন সুস্থ হলে তবে দিতে হয়।

লী। যদি মনের অসুখের সময় ছেলে মাই খাবার জন্যে কাঁদে।

ঠা। দেখ, যতক্ষণ মন খারাপ থাকে কখন ছেলেকে মাই দিস্‌নে। মনের দুঃখ ভুলে বেশ করে হাত পা ধুয়ে ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে মন ঠাণ্ডা হলে ছেলেকে কোলে করে তার মুখ দেখ্‌বি আর ভগবানের নাম কর্‌বি। যখন ছেলের স্নেহে আপনি মাই ঝরে দুধ পড়বে তখন মাই দিবি, বুঝ্‌লি।

লী। হ্যাঁ বুঝেছি। এখন দুধ ছাড়া আর কিছু পথ্য দেব কি না তা বল।

ঠা। ভাল কথা, খোকা কদ্দিনের হলরে, দাঁত উঠেছে ?

লী। ষেটের কোলে এই আট মাসে পড়েছে ঠাকুমা। ওপরে চারটা নীচে চারটা দাঁত উঠেছে।

ঠা। তা হলে খুব পুরাণ চালের ভাত সিদ্ধ করে চট্‌কে কাপড়ে ছেঁকেই হক কি খুব ফেনের মত করে চট্‌কেই হক দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিস্‌।

লী। ডাক্তারেরা বার্লি কি মেলিন্‌স্ ফুড্ কি হরলিকস্ মলটেড্ মিল্ক দিতে বলে ঠাকুমা।

ঠা। তা বার্লি দিতে হয় দিস্‌। সেত বিলাতী যব বই আর কিছু না। তবে তার এক রকম আস্ত পাওয়া যায় তার কি একটা ইংরিজী নাম আছে বাপু—

প্র। পার্ল বার্লি ঠাকুমা।

ঠা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই পারুল বার্লি সিদ্ধ করে দিস্। আর পারুল বার্লি না পেলে রামলক্ষণের গুঁড়ো বার্লি দিস্।

প্র। রাম লক্ষণ নয় ঠাকুমা রবিন্‌সন্।

ঠা। তা হবে ভাই, বুড়ো বয়সে মর্‌বার্ সময় এখন ঠাকুর দেবতার নামই মনে আসে।

লী। আর ঐ দুরকম ফুডের কথা যে বল্লাম তার কি বলো ঠাকুমা।

ঠা। ফুডের মুডের ধার্‌ত দিদি আমরা ধারিনে। তাতে কি আছে না আছে তাও জানিনে। তবে আমার শ্বশুর বল্‌তেন্ ওগুলো এদেশের ছেলের পক্ষে ভাল নয় তিনিও না বুঝে বল্‌বার লোক ছিলেন না। তাইতে মনে হয় ওগুলো ভাল নয়। আমার মনে হয় দেশী ভাতের মণ্ড, শটীর পালো, পানফলের পালো প্রভৃতি থাক্‌তে, ও বিলাতী ফুড, ছাই ভস্ম গুলো ব্যবহার কর্‌বার্ দরকার কি। ভগবান কি আর এদেশের রোগীর পথ্যি এদেশে হবার উপায় করেন নি।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা সাগুটা কি রকম?

ঠা। সাগুটা খুব হাল্‌কা জিনিস বলেই বোধ হয়, ওটা রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। সাগুতে একটু দাস্ত হয় আর বার্লিতে একটু দাস্ত কমায় এই তফাত্।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, দাঁত না উঠলে কি ভাত বার্লি কিছু দিতে নেই—তার মানে কি?

ঠা। দাঁত উঠ্‌লে ছেলে পিলে ভাত বার্লি সাগু এই সব হজম কর্‌তে পারে। সেই জন্যে আমাদের দেশে ছয় মাসে অর্থাৎ দাঁত ওঠ্‌বার সময় অন্নপ্রাশন দেবার নিয়ম আছে। সাধারণতঃ এই সময় থেকেই দুধের সঙ্গে ঐ সব জিনিষ কিছু দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার এমন অনেক ছেলে দেখা যায় যারা এক বৎসর পর্য্যন্ত দুধ ছাড়া কিছুই খায় না।

লী। দাঁত ওঠ্‌বার আগে সাগু বার্লি দিলে কিছু দোষ হয় ঠাকুমা? কিন্তু অনেক সময় ডাক্তারদের দিতে দেখেছি।

ঠা। দোষ যে হয় না এমন নয়। কেননা দাঁত ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সব জিনিষ দেওয়া উচিত। তবে ছেলে পিলের অসুখ হলে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সাগু বার্লি অবস্থা বুঝে দেওয়া যেতে পারে।

লী। আর কিছু দেব না?

না আর বড় কিছু নয় তবে একটু বেদানার রস কি আঙ্গুরের রস, কি মিষ্টি লেবুর রস দিতে পার।

লী। আচ্ছা পথ্যির কথা ত হল এখন ওষুধের কি হবে বল।

ঠা। দাস্ত কবার হয় আর কি রকম হয় বল দেখি।

লী। দাস্ত প্রায়ই রোজ একবার মেটে রঙ্গের গুট্‌লে বাহ্যে হয়, দৈবাৎ দু'বার হয়—তখন মেটে মেটে কাদা কাদা মল হয়। কোন কোন দিন বাহ্যে হয় না।

ঠা। আচ্ছা, এক কাজ কর। হপ্তায় কৈলে বাছুরের চোনা দুদিন করে দিবি, দুধ খাবার ঝিনুকের এক ঝিনুক করে দিলেই হবে।

লী। কৈলে বাছুর কি?

ঠা। অবাক কল্লি তোরা, কৈলে বাছুর কি তা জানিস্ না। মাই খেগো কচি বাছুরকে কৈলে বাছুর বলে, সেই মেদী কৈলে বাছুরের চোনা, বুঝ্‌লি।

লী। হ্যাঁ। আর কি করব?

ঠা। আর হপ্তায় দুদিন করে আলুই দিবি।

নী। আলুই কি?

ঠা। আলুই তয়ের করার কথাটা বলি শোন। বড় এলাচের খোসা ১টা, ছোট এলাচের খোসা ১টা, ধোয়া ঝাড়া পরিষ্কার জোয়ান দু আনা ওজন আর টাট্‌কা কালমেঘের পাতা পোকা ধরা না হয়, আধ ভরি ওজন, নিয়ে ঠাণ্ডা জলে বেশ পরিষ্কার শিল নোড়ায় খুব চন্দনের মতন করে বেটে, ছোট মটরের মত বড়ি তোয়ের কর্‌বি। এই বড়িকেই আলুই বলে। নীবার হলে কোন ছেলের বাহ্যে শক্ত হয় রোজ হয়ত হয় না। আবার কোন কোন ছেলের বার বার পাৎলা বাহ্যে হয়। যাদের পাৎলা বাহ্যে হয় তাদিকেও আলুই দেওয়া যায়—কেবল কালমেঘের পাতা কিছু কম করে দিয়ে আলুই তোয়ের করতে হয়। বেশ করে মনে রাখিস্, আলুই ছেলের অমৃত।

নী। আচ্ছা তাই করে দেব, আর কিছু দিতে হবে না?

ঠা। না এখন আর কিছু নয়। এই দিয়ে কিছু দিন দেখ, যদি ভগবানের দয়ায় ক্রমে ভাল হতে থাকে তবে আর কিছুর দরকার হবে না।

নী। ভাল মন্দ কি করে বুঝব?

ঠা। ভাল হলে ফ্যাকাশে ভাব থাকবে না, চোখের কোলে ক্রমশঃ বেশী রক্ত হতে থাকবে, ছেলে বেশ চন্‌মনে থাক্‌বে, হাঁসি খেলা করবে, আর কাঁদবে। যদি বেশী হয় তাহলে আরও ফ্যাকাশে হবে চোখের কোণ আরও শাদা হতে থাক্‌বে, ছেলে নির্জীব পানা হবে, খেঁত্‌খেঁতে হবে আর বেশী কাঁদবে।

নী। হ্যাঁ, ভাল কথা ঠাকুমা, একটু গা ছ্যাক্ ছ্যাঁক্ করে বলেছিলাম তার কি হবে?

ঠা। স্পষ্ট জ্বর হয় বুঝ্‌তে পারিস্?

নী। না, তা হয় না, মধ্যে মধ্যে যে গাটা গরম'গরম বোধ হয়!

ঠা। তা হলে এখন দুচার দিন থাক। যদি জ্বর হয় তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে।

নী তা আমিত কাল চলে যাব, কবে আসব তার ঠিক নাই। জ্বর হলে কি করব, তাই শুনে রাখি।

ঠা। দেখ, নীবারের জ্বর দুপুরের সময় বা বিকালের দিকেই হয়। গা একটু একটু গরম হয়, সে সময় একটু নির্জীব আর খেঁত্‌খেঁতে হয়, যদি এরকম দেখিস, তা হলে সকালে হপ্তায় দুদিন করে চোনা আর আলুই যেমন দিতে বলিছি তাই দিবি আর রোজ বিকালে একটু করে ঘুষ্‌ড়ো রস দিবি।

নী। ঘুষ্‌ড়ো আবার কি?

ঠা। ঘুষ্‌ড়ো অনেক রকম হয়, তবে একে যে ঘুষড়ো দিতে হবে তা বলি শোন। ক্ষেত্‌পাপড়া, শিউলী পাতা, গুলঞ্চ আর কালমেঘ টাট্‌কা যোগাড় কর্‌তে হবে। পাড়াগায়ে যোগাড় করে নিতে হয় আর কলকাতায় চাঁদনী, নূতন বাজার, শোভাবাজার, বৌবাজার, মেছোবাজার আর মাধব বাবুর বাজারে যে বেদেরা বসে তাদের বলে রাখলে দরকারমত এনে দেয়। এগুলি যোগাড় হলে, সব সমান ভাগে নিয়ে বেশ করে ধুয়ে কুটে নিবি। একখানা কচি কলাপাতায় জড়িয়ে কলার ছোটা দিয়ে বাঁধ্‌বি, আর তার ওপর দুই আঙ্গুল পুরু করে মাটীর লেপ দিবি। তার পর ঘুঁটের আগুণে পোড়াবি। ওপরের মাটী লাল হলে, দিনে ঘরে আর রাত্রে শিশিরে রাখবি। রোজ বিকেলে তারি আধ্‌ঝিনুক আন্দাজ রস ১০।১৫ ফোটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে]

খাইয়ে দিবি। একদিন ঘুষ্‌ড়ো তয়ের করিলে পরদিন তা থেকে রস নেওয়া চলে না। রোজ করতে হয়।

লী। এরকম তয়ের করাও শক্ত।

ঠা। শক্ত আর কি একটু কষ্ট করলেই হয়।

তবে নেহাত অসুবিধে হলে কলাপাতা জড়িয়ে বেঁধে, আগুনে তাওয়া চড়িয়ে, তার ওপর রেখে এপিট ওপিট করে ভেজে নিবি। যখন কলাপাতা ঝলসা পোড়া হবে তখন নামিয়ে নিবি। এরকমে করলে খুব সহজে হয়।

লী। আর টাট্‌কা গাছ গাছড়া সব যদি না পাওয়া যায়।

ঠা। পাওয়া যাবে না কেন, একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। আজ কাল তৈয়ারী শিশি ভরা ডাক্তারী ওষুধ পাওয়া যায়, ঢেলে খেলেই হল, তাই লোকে একটু কষ্ট করতে নারাজ। নইলে গাছ গাছড়ার অভাব কি? তবে ক্ষেত্‌পাপড়াটা সব সময়ে না মিলতে পারে। তা হলে করবি কি জানিস্—পাচনের দোকান থেকে শুক্‌নো অথচ বেশ টাট্‌কা—যেন পচা না হয়, ক্ষেত্‌পাপড়া আনিয়ে, জলে ভিজিয়ে তাই কুটে দিবি। ভাল শুক্‌নো ক্ষেত্‌পাপড়া না পেলে ক্ষেত্‌পাপড়া বাদ দিয়ে ঘুষ্‌ড়ো করবি।

লী। আচ্ছা—নাওয়া কি বন্ধ থাকবে?

ঠা। যদি জ্বর হয় তা হলে বন্ধ থাকবে।

আর তা না হলে শরীরের ভাবগতিক দেখে যেমন সয় ২।৩ দিন অন্তর কাঁচা পাকা জলে নাইয়ে দিবি। নাওয়াবার সময় যেন ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে না লাগে। আর নাবার পরেই একটা মোটা জামা গায়ে দিয়ে দিবি।

লী। সব কথাই আমি জেনে নিয়েছি। এখন আশীর্ব্বাদ কর ঠাক্‌মা খোকা আমার যেন নীরোগ হয়।

ঠা। আচ্ছা আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোর খোকা ভাল হবে। কিন্তু একজন-ভাল ব্রাহ্মণ ডেকে একটু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিস্।

লী। আচ্ছা তা করবো। হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি বলেছ যে কচি বেলা থেকে আগুনের মত আরোক গুলো চক্ চক্ গিলিয়ে ছেলে পিলের লিভার হয় সত্যিই কি তাই?

ঠা। না সব ছেলের যে সেই জন্যে নীবার হয় তা নয়, তবে কতক সে জন্যেও হয় বলে আমার মনে হয়।

লী। তবে আর কি জন্যে লিভার হয় ঠাক্ মা?

ঠা। প্রায়ই বাপ্মার অম্বলের দোষ থাক্‌লেই ছেলে পিলের লিভার হয়। আজ কালকার দুধ, জিনিষ পত্র সব ভেজাল, তার ওপর নানা রকম অত্যাচার করে, আগে কার মত লোকে আর সংযমী নয়, এই সবের জন্যে বেশীর ভাগ লোকেরই গরহজম অম্বলের বেয়ারাম। কাজেই তাদের ছেলেপিলের লিভার হয়। আর গাদা গাদা ডাক্তারী ওষুধ পড়ে, নীবার বেগড়াবার বেশ সুবিধে ঘটে।

আর একটা কথা, আগে কচি ছেলেদের চোনা ও আলুই খাওয়ান হত। তাতে নীবার ভাল থাক্‌ত আর নীবারের কোন অসুখ হত না। এখনত সে প্রথা আর নেই। আর এজন্যেও ছেলে পিলের নীবারের রোগ বেশি হচ্চে।

লী। তা এমন ভাল প্রথা উঠে গেল কেন?

ঠা। দেশের লোকের মতিভ্রম। ডাক্তারীর মোহে পড়ে লোকে এমন হিতকর প্রথা উঠিয়ে দিয়েচে। তার কুফলও ঘরে ঘরে দেখা যাচ্চে।

নী। আবার কি সে প্রথা চালান যায় না?

ঠা। আজ কাল চেষ্টা করলে কতকটা হতে পারে বলে মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির মোহ যেন কতকটা কেটে আস্‌ছে। এখন অনেকে বুঝেছে যে দেশে অনেক ভাল জিনিষ আছে। এখন যদি লোকে আবার কচি ছেলেদের চোনা আলুই খাওয়ায় তাহলে নীবারের রোগ অনেক কমে যাবে।

নী। চোনা আলুই কি রোজ দিতে হয়।

ঠা। না—দরকার বুঝে হপ্তায় দুদিন, তিনদিন কি চার দিন দিলেই চলে।

নী। দরকার কি করে বোঝা যায়?

ঠা। কচি ছেলে পিলে রোজ ৩।৪ বার হলদে হলদে বাহ্যে করে। তা না হয়ে যদি কম, কি মেটে মেটে, কি গুটলে বাহ্যে করে তবে বুঝতে হবে যে নীবারের দোষ হয়েছে। যার যত বেশী দোষ হয় তাকে তত বেশী দিন খাওয়াতে হয়।

প্র। ঠাক্‌মা আমি তোমার নাত্‌নীর হুকুমে মুখটী বুজে চুপটী করে বসে আছি, বাহবা দিতে পারি নি। কিন্তু তোমার ব্যবস্থা বড় পাকা বলে বোধ হচ্চে। আর ছেলে পিলের লিভার হবার যে কারণ বলেছ আমারও তাই মনে হয়। এখন বাড়ী ফেরবার সময় হল, পায়ের ধূলো দাও আর খোকাকে ভাল করে আশীর্ব্বাদ কর।

ঠা। এস দাদা এস। খোকা তোমার ভাল হয়ে যাবে ভাই, আমি আশীর্ব্বাদ করছি। মধ্যে মধ্যে লীলা সঙ্গে করে দেখা দিয়ে যাস্। আর্ত বেশী দিন নয়। তোদের হাসি মুখ দেখে যেতে পারলেই হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একণে আমরা চিকিৎসা বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের কৃতিত্ব নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। অন্যান্য চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে বিবিধ বিষয় উদ্ধৃত না করিলে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিশেষ পরিস্ফুট হইবে না। তজ্জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আবশ্যক মত বচনাদি উদ্ধৃত করিব। কিন্তু কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে চিকিৎসার কোন সার্থকতা আছে কি না সে সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কেননা এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আজ কাল অনেক মনস্বী ব্যক্তি গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত। অপিচ, অনেক সুবিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসক চিকিৎসা-শাস্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত নিরুৎসাহকর। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

Said Sir John Forbes, M. D., F. R. S. "Some patients get well with the aid of medicine, more without it, and still more in spite of it."

2, Said the Dublin Medical Journal, "Assuredly the uncertain and most unsatisfactory art that we call medical science is no science at all, but a jumble of inconsistent opinions, of conclusions hastily and often incorrectly drawn, of facts misunderstood or perverted, of comparisons without analogy, of hypothesis without reason, and of theories not only useless but dangerous.

3. Said Dr. Bostwich, author of the "History of Medicine." " Every dose of medicine given is a blind experiment on the vitality of the patient."

4. Said James Johnson, M. D., F. R. S., editor of The Medico-chirurgical Review—"I declare as my concientious conviction founded on long experience and reflection, that if there was not a single Physician, Surgeon, Man-midwife, Chemist, Apothecary, Druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality than now prevail."

5. Prof. J. W. Carson, of the New York College of Physicians and Surgeons, says,—"We do not know whether our patients recover because we give them medicine or because nature cures them. parhaps breadpills would cure as many as medicine."

6. The eminent Dr. Alonzo clark, a professor in the same Medical College, states that, in their zeal to do good physicians have done much harm, they have hurried many to the grave who would have recoverd if left to nature" and that "all of our curative agents are poisons and as a consequence, diminishes the patients vitality."

7. Prof. Martin Paine, of the New York University Medical College, asserts that "durg medicines do but cure one disease by producing another" a sentiment with which the late Prof. Liebig, the well known German chemist agreed.

১। স্যরজন ফরবেস এম, ডি, এফ, আর, এস্ বলিয়াছেন—"কতক গুলি রোগী ঔষধের সাহায্যে আরোগ্যলাভ করে। তদ্পেক্ষা অধিক রোগী ঔষধ ব্যতীত ভাল হয়। তদপেক্ষা অধিক রোগী ঔষধকে তাচ্ছিল্য করিয়া ভাল হয়"।

২। ডব্লিন্ মেডিক্যাল্ জর্নাল্ বলিয়াছেন—"ইহা নিশ্চয় যে আমরা যে অনিশ্চিত এবং অসন্তোষকর বিদ্যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলি, তাহা একেবারেই বিজ্ঞান নয়। ইহা কেবল অনিশ্চিত মতের সমষ্টি, হঠকৃত এবং প্রায়শঃ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ভ্রমাত্মক এবং বিপরীত তথ্য, অসদৃশ তুলনা এবং অহেতুকী ধারণা কেবল অনাবশ্যক নহে পরন্তু বিপজ্জনক মত মাত্র।

৩। চিকিৎসার ইতিহাস নামক গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার বস্ উইচ বলেন :—রোগীকে এক এক মাত্রা ঔষধ দেওয়া কেবল রোগীর জীবনী শক্তির উপরি অন্ধ পরীক্ষা মাত্র।

৪। মেডিকো চিরুরজিক্যাল পত্রের সম্পাদক ডাক্তার জেমস্ জন্‌সন্ এম, ডি, এফ, আর, এস, বলেন: দীর্ঘ কালের বহুদর্শিতা এবং চিন্তা দ্বারা আমার বিহিত ধারণা জন্মিয়াছে যে, যদি চিকিৎসক, শস্ত্র চিকিৎসক, ধাত্রী-বিদ্যা-বিশারদ, রসায়ন-বিদ্, ঔষধ প্রস্তুতকারক এবং ঔষধ বিক্রেতা না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে রোগ এবং মৃত্যুর সংখ্যা কম হইত।

৫। নিউইয়র্কের কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানস্ এবং সার্জ্জেনের অধ্যাপক জে. ডবলু কার্‌সন্ বলেন:—আমরা জানিনা যে আমরা রোগীদিগকে ঔষধ দিই বলিয়া তাহারা ভাল হয় অথবা প্রকৃতি তাহাদিগকে আরোগ্য করে। আমার ঔষধে যেমন রোগ ভাল হয়, রুটীর বড়ি করিয়া দিলেও সেইরূপ ভাল হয়।

৬। উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার এলোনজো ক্লার্ক বলেন:—"চিকিৎসকগণ রোগীদের হিত করিবার উদ্দেশে অনেক অহিত করিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বাঁচিত, এরূপ অনেককে তাহারা শীঘ্র মৃত্যু মুখে পাতিত করে। তিনি আরও বলিয়াছেন—আমাদের রোগ ভাল করিবার ঔষধগুলি বিষ এবং সেই জন্য উহারা রোগীর জীবনী শক্তি হ্রাস করে।

৭। নিউইয়র্ক ইউনিভারসিটী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মার্টিন পেইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—"ঔষধগুলি এক রোগ নষ্ট করিয়া অন্য রোগ উৎপন্ন করে। জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ অধ্যাপক লেবিগ্ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের সার্থকতা আছে কি না—এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা অধুনা অনেক সুধী ব্যক্তির মস্তিষ্ক পীড়ার কারণ হইলেও, উহা বহু প্রাচীন যুগের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমরা নিজের ভাষায় না বলিয়া এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

চতুষ্পাদং ষোড়শকলং ভেষজমিতি ভিষজো ভাষন্তে। যদুক্তং পূর্ব্বাধ্যায়ে ষোড়শগুণমিতি তদ্ভেষজম্ যুক্তিযুক্ত মলমারোগ্যায়েতি ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ পুনর্ব্বসু আত্রেয় বলিয়াছেন:—ভিষকৃগণ বলেন যে ষোড়শকলাবিশিষ্ট চতুষ্পাদই ভেষজ*। পূর্ব্বাধ্যায়ে ঐ চারিপাদের যে ষোলটী গুণ বলা হইয়াছে তাহাই ভেষজ‡। ঐগুলি যুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

নেতি মৈত্রেয়ঃ। কিং কারণং? দৃশ্যন্তে হ্যাতুরাঃ কেচিদুপকরণবন্তশ্চ পরিচারকসম্পন্নাশ্চ আত্মবন্তশ্চ কুশলৈশ্চ ভিষগ্‌ভিরনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানা স্তথাযুক্তা শ্চাপরে ম্রিয়মানা স্তস্মাদ্ভেষজ মকিঞ্চিৎকরং ভবতি।

---

* চতুষ্পাদ যথা, ভিষগ্ দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্। (অনুবাদ) ভিষক্, দ্রব্য (ঔষধ), শুশ্রূষাকারী এবং রোগী এই চারিটী পাদ।

‡ শাস্ত্রে নির্ম্মল জ্ঞান, বহুদর্শিতা, চিকিৎসাকার্য্যে দক্ষতা এবং পবিত্রতা এই চারিটী চিকিৎসকের গুণ। প্রচুরতা, রোগনাশকতা, নানাপ্রকারে প্রযুক্ত হইবার উপযোগিতা এবং পূর্ণতা ও দোষরাহিত্য এই চারিটী ঔষধের গুণ। শুশ্রূষা করিতে জানা, দক্ষতা, রোগীর প্রতি অনুরাগ থাকা এবং পবিত্রতা এই চারিটী শুশ্রূষাকারীর গুণ। স্মৃতিমান্ হওয়া বৈদ্যের ব্যবস্থামত চলা, অভীরুত্ব এবং রোগের বিষয় ঠিক বলা এই চারিটী রোগীর গুণ।

মৈত্রেয় বলিলেন—ইহা ঠিক নহে। কেন না দেখা যাইতেছে যে কোন কোন রোগী উপযুক্ত উপকরণ (ঔষধ পথ্যাদি) যুক্ত, উপযুক্ত পরিচারকযুক্ত, আত্মবন্ত (অর্থাৎ অত্যাচারী নহে) এবং সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে। আবার কোন রোগী ঐরূপ হওয়া সত্বেও মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং ভেষজ কোন কাজেরই নহে।

তদ্ যথা। শ্বভ্রে সরসি চ প্রসিক্তমল্পমুদকম্। নদ্যাং স্যন্দমানায়াং পাংশুধানে পাংশুমুষ্টিঃ প্রকীর্ণ ইতি। তথাপরে দৃশ্যন্তে অনুপকরণা শ্চাপরিচারকা শ্চানাত্ম-বন্ত শ্চাকুশলৈশ্চ ভিষগ্‌ভি রনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানাঃ। তথাযুক্তা ম্রিয়মাণা শ্চাপরে। যতশ্চ প্রতিকুর্ব্বন্ সিধ্যতি, প্রতিকুর্ব্বন্ ম্রিয়তে অপ্রতিকুর্ব্বন্ সিধ্যতি, অপ্রতিকুর্ব্বন্ ম্রিয়তে ততশ্চিন্ত্যতে ভেষজমভেষজেনাবিশিষ্ট মিতি।

চিকিৎসা কেমন অকিঞ্চিৎকর? না যেমন প্রকাণ্ড গহ্বরে বা জলপূর্ণ সরোবরে অল্প জল নিক্ষেপ করা, প্রবহমান নদীতে কিংবা পাংশুরাশিতে এক মুষ্টি পাংশু (ধূলি) নিক্ষেপ করা। আবার দেখা যায় যে উপকরণ (ঔষধ, পথ্য) নাই, পরিচারক নাই, রোগী অনাত্মবন্ত (অত্যাচারী) চিকিৎসক ভাল নহে, অথচ এরূপ স্থলেও রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে। আবার ষোড়শকল ভেষজসম্পন্ন হইলেও রোগী মরিয়া যাইতেছে। অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে চিকিৎসা করিলে ভালও হয় এবং মরিয়াও যায়, আবার চিকিৎসা না করিলে ভালও হয় এবং মরিয়াও যায়, তখন ভেষজ হইতে অভেষজ পৃথক নহে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ চিকিৎসা করাও যা—আর না করাও তা।

মৈত্রেয় মিথ্যা চিন্ত্যত ইত্যাত্রেয়ঃ। কিং কারণং? যে হ্যাতুরাঃ ষোড়শগুণ-সমুদিতেনানেন ভেষজেনোপপদ্যমানা ম্রিয়ন্তে ইত্যুক্তম্ তদনুপপন্নম্। ন হি ভেষজ সাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজমকারণং ভবতি। যে পুন রাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদৃতে সমুত্তিষ্ঠন্তে ন তেষাং সম্পূর্ণভেষজোপপাদনায় সমুত্থানবিশেষোঽস্তি। যথাহি পতিতং পুরুষং সমর্থমুত্থানায়োত্থাপয়ন্ পুরুষো বলমপ্যোপাদধ্যাৎ স ক্ষিপ্রতর মপরিক্লিষ্ট এবোত্তিষ্ঠেৎ তদ্বৎ সম্পূর্ণ-ভেষজোপলম্ভাদাতুরাঃ। যে চাতুরাঃ কেবলাদ্ভেষজাদপি ম্রিয়ন্তে, ন চ সর্ব্বএব তে ভেষজোপপন্নাঃ সমুত্তিষ্ঠেরন্। ন হি সর্ব্বে ব্যাধয়ো ভবন্ত্যপায়সাধ্যাঃ॥

আত্রেয় বলিলেন, মৈত্রেয় তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা মিথ্যা। কেননা তুমি যে বলিলে যে ষোড়শগুণসমন্বিত ভেষজ সংযুক্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা অযুক্তিযুক্ত। কারণ ভেষজসাধ্য ব্যাধিতে ভেষজ প্রয়োগ অকারণ হয় না। আবার যে সকল রোগী ভেষজ ব্যতীত আরোগ্যলাভ করিতে পারে, তাহারা ভেষজযুক্ত হইলে আরও শীঘ্র এবং বিনা ক্লেশে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যেমন গর্ত্তে পতিত পুরুষ স্বয়ং উঠিতে সক্ষম হইলেও, যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়া দেয় তাহা হইলে সে আরও শীঘ্র এবং বিনাক্লেশে উঠিতে পারে, সেইরূপ রোগীও সম্পূর্ণ ভেষজযুক্ত হইলে শীঘ্র ভাল হয়। যে সকল রোগী ভেষজের অভাবে মরিয়া যাইতেছে তাহারা সকলেই যে ভেষজযুক্ত হইলে বাঁচিত, তাহা নহে। কারণ সকল রোগ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না।

ন চোপায়সাধ্যানাং ব্যাধীনা‌মনুপায়েন

সিদ্ধিরস্তি, ন চাসাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজ সমুদায়োঽয়মস্তি, নহ্যলং জ্ঞানবান্ ভিষক্ মুমূর্ষু-মাতুরমুখাপয়িতুং। পরীক্ষাকারিণো হি কুশলা ভবন্তি। যথা হি যোগজ্ঞোঽভ্যাসনিত্য ইষ্বাসো ধনুরাদায়েষুমপাস্যন্ নাতিবিপ্রকৃষ্টে মহতি কায়ে নাপরাধো ভবতি সম্পাদয়তি চেষ্ট-কার্য্যম্; তথা ভিষক্ স্বগুণ-সম্পন্ন উপকরণ-বান্ বীক্ষ্যকর্ম্মারভমাণঃ সাধ্যরোগমনপবাধঃ সম্পাদয়ত্যেবাতুরমারোগ্যেণ। তস্মান্ন ভেষজ-মভেষজেনাবিশিষ্টং ভবতি।

চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি চিকিৎসা ব্যতীত প্রশমিত হয় না। আবার অসাধ্য ব্যাধি চিকিৎসা দ্বারা ও ভাল হয় না। চিকিৎসক যতই জ্ঞানবান্ হউন্ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কখনই আরোগ্য করিতে পারেন না। যে চিকিৎ-সক রোগ সাধ্য কি অসাধ্য পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করেন, তিনিই সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। যেরূপ অভ্যাসশীল কুশলী ধনু-র্দ্ধর ধনুতে শর যোজনা করিয়া অনতিদূরস্থ বৃহৎ পদার্থ অনায়াসে বিদ্ধ করিতে পাবেন, সেইরূপ গুণবান্ ও উপকরণবান্ ভিষক্ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিলে সাধ্যরোগগ্রস্ত রোগীকে অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারেন। সেইজন্য ভেষজ অভেষজ হইতে বিশিষ্ট নহে, ইহা বলা যাইতে পারেনা। অর্থাৎ অবশ্যই চিকিৎসার সার্থকতা আছে।

ইদঞ্চেদঞ্চ নঃ প্রত্যক্ষং যদনাতুরেণ ভেষজে-নাতুরং চিকিৎস্যামঃ। ক্ষামমক্ষামেণ কৃশঞ্চ দুর্ব্বলমাপ্যায়য়ামঃ স্থূলং মেদস্বিনমপতর্পয়ামঃ। শীতেনোষ্ণাভিভূত মুপচরামঃ। শীতাভিভূত-মুষ্ণেণ। ন্যূনান্ ধাতূন্ পূরয়ামঃ। ব্যতিরিক্তান্ হ্রাসয়ামঃ। ব্যাধীন্ মূলাবিপর্য্যয়ণোপচরন্তঃ সম্যক্ প্রকৃতৌ স্থাপয়ামঃ। তেষাং নস্তথা কুর্ব্বতাময়ং ভেষজসমুদায়ঃ কান্ততমো ভবতি।

ইহাও আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ঔষধ প্রয়োগে রোগী আরোগ্য হইতেছে। ক্ষীণ, কৃশ ও দুর্ব্বল, পুষ্টিকর ঔষধ দ্বারা ও সবল হইতেছে। স্থূল ও মেদস্বী ব্যক্তি অপ-তর্পণ ঔষধ প্রয়োগে কৃশ ও অল্পমেদ বিশিষ্ট হইতেছে। শীতল ঔষধ প্রয়োগে উষ্ণাভি-ভূত ব্যক্তির এবং উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে শীতা-ভিভূত ব্যক্তির পীড়ার শান্তি হইতেছে। ঔষধ দ্বারা ক্ষীণ ধাতুর পুষ্টি হইতেছে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস হইতেছে। কারণের বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ব্যাধির শান্তি হইতেছে। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ব্যাধিতের পক্ষে ঔষধ নিতান্ত হিতকর।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেরই একটা মূলসূত্র আছে এবং সেই মূলসূত্রের উপরেই চিকিৎসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। অ্যালো-প্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে উহার মূল সূত্র :—

Contraria contraris curantur. অর্থাৎ বিপরীত পদার্থ দ্বারা বিপরীত লক্ষণা-ক্রান্ত ব্যাধির উপশম হয়। পাশ্চাত্য দেশের অন্যতম চিকিৎসা শাস্ত্র হোমিওপ্যাথিক মতে Similia similibus curantur. অর্থাৎ সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা সমধর্ম্মীরোগ প্রশ-মিত হইয়া থাক। উভয়ের মূল সূত্র একে-বারে বিপরীত। এমন হয় কেন? উভয়ের মধ্যে একটী নিশ্চয় ভ্রমাত্মক। কেননা হাঁ এবং না কখনই এক হইতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনটীই ভ্রমাত্মক নহে। তবে ঐ দুইটী বিভিন্ন মতকে এক দেশ-দর্শন-দুষ্ট বলা যাইতে পারে। অন্যত্র এই বিভিন্নমতবাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। সে কোথায়? জগতের প্রাচীনতম এবং যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক আয়ুর্ব্বেদে।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্তবিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্।
ঔষধান্নবিহারাণা মুপযোগঃ সুখাবহম্।
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ স হিসাত্ম্যমিতি স্মৃতম্॥

হেতুর বিপরীত, ব্যাধির বিপরীত, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত অথবা হেতুব্যাধি উভয়ের বিপরীত না হইলেও অর্থাৎ উহাদের সমধর্ম্মী হইলেও, যে সকল ঔষধ, অন্ন এবং বিহার দ্বারা ব্যাধির উপশম হয় তাহাকে সাত্ম্য বলা যায়। ইহাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূল সূত্র। একটু বিশদভাবে সূত্রটী বুঝান যাইতেছে।

য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপরীত দ্রব্য দ্বারা বিপরীত ব্যাধির শান্তি হয়, কিসের বিপরীত? হেতুর না ব্যাধির, না উভয়ের? ইহার কোন সদুত্তর ঐ তিনটী কথার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে উহা বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠকদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ কতকগুলি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

হেতুর বিপরীত, যথা, কফজনিত শীত যুক্ত জ্বরে উষ্ণবীর্য্য শুণ্ঠী প্রভৃতি। অন্ন যথা,—শ্রম ও বায়ু জনিত জ্বরে, শ্রম ও বায়ু নাশক মাংসের যূষ। বিহার যথা, দিবানিদ্রাজনিত কফে রুক্ষতাজনক রাত্রিজাগরণ। ব্যাধির বিপরীত ঔষধ যথা, অতিসারে সঙ্কোচক (Astringent) আকনাদি, বিষে বিষনাশক শিরীষ, কুষ্ঠে কুষ্ঠনাশক খদির প্রভৃতি। অন্ন যথা, অতিসারে মলস্তম্ভক মসূরের যূষ। বিহার যথা, উদাবর্ত্তে প্রবাহণ। হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত ঔষধ যথা, বাতজ শোথে বায়ু ও শোথ নাশক দশমূল। অন্ন যথা—বাতকফ জনিত গ্রহণী রোগে বাত, কফ ও গ্রহণী নাশক তক্র।

বিহার যথা—স্নিগ্ধ দিবা স্বপ্নজাত তন্দ্রায় রুক্ষ তন্দ্রা বিপরীত জাগরণ। এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা Coutraria Contraris Curantur. এইবার Similia similibus Curantur. দেখুন।

হেতু বিপরীতার্থকারী (অর্থাৎ হেতুর সমধর্ম্মী হইলেও রোগ নাশক) ঔষধ যথা—পিত্ত প্রধান পচ্যমান ব্রণশোথে (ফোড়া) পিত্তকর উষ্ণ উপনাহ (পুলটীস)। অন্ন যথা, পিত্ত প্রধান পচ্যমান ব্রণশোথে পিত্তবর্দ্ধক বিদাহী অন্ন। বিহার যথা বায়ু জনিত উন্মাদ রোগে বায়ু বর্দ্ধক ত্রাসন। ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ যথা, বমন রোগে বমন কারক মদন ফল। অন্ন যথা, অতিসারে বিরেচন জন্য বিরেচক দ্রব্য-সিদ্ধ দুগ্ধ। বিহার যথা, বমন রোগে প্রবাহন (বেগ দান)। হেতু ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ যথা, অগ্নিদগ্ধ স্থানে উষ্ণ অগুরু প্রভৃতির প্রলেপ। অন্ন যথা, মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগে (Alcoholism) মত্ততা জনক মদ্য। বিহার যথা, ব্যায়াম জনিত সংমূঢ়বাত নামক রোগে জল-সন্তরণরূপ ব্যায়াম।

অবশ্য ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের সহিত হোমিওপ্যাথির মতের বিরোধ আছে। কিন্তু আমরা চিকিৎসার সূত্রের কথা বলিয়াছি।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে জগতের দুইটী প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রের বিরোধী মূল সূত্রের সামঞ্জস্য প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রক্ষিত হইয়াছে।

হরীতকী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরীতকী গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বদোষজ বাতরক্ত নষ্ট হয় (সুশ্রুত)। তিনটী বা পাঁচটী হরীতকী সেবন করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে উগ্র বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়। হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈল সহ সেবন করিলে আমবাত, গৃধ্রসী (Scitica) ও বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। ঘৃত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন পিত্ত শূলের পক্ষে হিতকর (ভাব প্রকাশ)। গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন গুল্মে হিতকর (সুশ্রুত)। হরীতকীর আঁটীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ অশ্মরী (পাথরী) রোগে হিতকর (বাভট)। রসায়ন-বিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে (চবক)। গুড়ের সহিত হরীতকী ক্রমবৃদ্ধি নিয়মে এক মাস কাল সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, মুখরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি, জীর্ণজ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী এবং অন্যান্য কফবাতজ রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ ও এরণ্ড তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিলে দীর্ঘকালজ বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথের সহিত এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফবাতজনিত বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়। হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া পিপুল ও সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী-চূর্ণ সেবন করিলে শ্লেষ্মজ শ্লীপদ রোগ নষ্ট হয় (সুশ্রুত)। হরীতকীচূর্ণ সম পরিমাণ নিম্বপত্রচূর্ণ সহ সেবন করিলে এক বা দেড় মাসে কুষ্ঠ ভাল হয়। হরীতকী সম পরিমাণ কিস্‌মিসের সহিত পেষণ করিয়া পুরাতন গুড় ও মধু সহ সেবন কবিলে অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরীতকী লৌহ পাত্রে হরিদ্রার রসে ঘর্ষণ করিয়া তদ্দারা চিপ্প (আঙ্গুলহাড়া) পুনঃ পুনঃ লিপ্ত করিবে (বঙ্গসেন)। হরীতকীর কাথ মধু সহ সেবন করিলে কণ্ঠরোগে উপকার হয় (বাভট)। হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিলে নানাপ্রকার নেত্র-রোগ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত)। হরীতকী গব্য ঘৃতে উত্তপ্ত করিয়া সেবন করিবে, এবং পরে দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হরীতকী উৎকৃষ্ট রসায়ন। রসায়ন কাহাকে বলে? ঔষধ দ্বিবিধ। কতকগুলি সুস্থব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক এবং কতকগুলি ব্যাধি-তের রোগ নাশক। সুস্থের শুক্রস্কর ঔষধ আবার দ্বিবিধ, যথা, রসায়ন ও বাজীকরণ। তন্মধ্যে রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী যৌবন, প্রভা, বর্ণ, সুস্বরতা, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, বাক্‌সিদ্ধি, বিনয় এবং শান্তি লাভ করা যায়। প্রশস্ত রসাদি ধাতু সমূহ লাভ করা যায় বলিয়া উহার নাম রসায়ন।

সিন্ধূত্থ শর্করা শুণ্ঠী কণা মধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

অনুবাদ :—সৈন্ধবলবণ, চিনি, শুণ্ঠী,

পিপুল, মধু ও গুড় এই ছয়টী দ্রব্যের সহিত বর্ষাদি ছয় ঋতুতে হরীতকী সেবন করিলে রসায়নের ফল লাভ করা যায়। এস্থলে বলা উচিত যে আয়ুর্ব্বেদে শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, মাঘ ও ফাল্গুন শীত, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম এইরূপ সাধারণ ঋতু বিভাগ করা হইয়াছে।

রসায়ন ঔষধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে দিগ্‌দর্শন জন্য দুই চারিটী বিষয় বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধদেহঃ সমাচরেৎ।
অবিশুদ্ধশরীরস্তু যুক্তো রসায়নো বিধি-
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ।

অনুবাদঃ—যৌবনের প্রারম্ভে কিংবা প্রৌঢ় বয়সে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়। এতদ্দ্বারা কথিত হইল যে বৃদ্ধ ব্যক্তি রসায়নের অধীকারী নহে। এবং (বমন বিরেচনাদি দ্বারা) শরীর শোধন করিয়া রসায়ন সেবন করিতে হয়। কেননা—মলিন বস্ত্রে যেরূপ ভাল রং ধরেনা, সেইরূপ অবিশুদ্ধ শরীরে রসায়ন ঔষধ কার্য্যকারী হয়না।

অপিচ,

যথাস্থূলমনির্ব্বাহ্য দোষান্ শারীর মানসান্।
রসায়ন গুণৈ র্জন্তু র্যুজ্যতে ন কদাচন॥
যোগা হ্যায়ুঃপ্রকর্ষার্থা জরারোগনিবর্হনা।
মনঃ শরীরশুদ্ধানাং সিধ্যন্তি প্রযতাত্মনাম্॥

অনুবাদ :—শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত না হইলে সে ব্যক্তি কখন রসায়ন ঔষধ সেবনের ফলপ্রাপ্ত হয় না। যে সকল ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত এবং সংযতাত্মা তাঁহারাই আয়ুঃবর্দ্ধক ও জরাপ্রতিষেধক রসায়ন ঔষধের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

রসায়নার্থ পূর্ব্বকথিতরূপে হরীতকী প্রয়োগকে ঋতু হরীতকী বলে। ঋতু হরীতকীর মাত্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়।

বর্ষাকালে হরীতকী ছয় মাষা ও সৈন্ধব লবণ দুই মাষা, গিলিয়া খাইবে। শরৎ কালে হরীতকী পাঁচমাষা ও চিনি ৪ মাষা খাইয়া শীতল জল পান করিবে। হেমন্তে হরীতকী তিন মাষা ও শুণ্ঠী দুইমাষা খাইয়া উষ্ণজল পান করিবে। শীতকালে হরীতকী তিনমাষা ও পিপুল দুই মাষা সেবন করিয়া উষ্ণজল পান করিবে। একমাষা ১০টী কুঁচের সমান।

এইরূপ সাধারণ মাত্রায় উল্লেখ থাকিলেও অবস্থাভেদে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ক্ষতরোগে—হরীতকীসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয়। সূক্ষ্ম হরীতকী চূর্ণ গব্য ঘৃত সহ মলমের ন্যায় করিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষত প্রশমিত হয়। হরীতকী অন্তর্ধূমে* ভস্ম করিয়া ক্ষত স্থলে প্রয়োগ করিলে ক্ষত ভাল হয়।

নেত্র-রোগে—হরীতকীসিদ্ধ জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে নেত্র রোগ জন্মিতে পারে

* রুদ্ধ পাত্রের মধ্যে ভস্ম করিলে তাহাকে অন্তর্ধূমে ভস্ম করা বলে। উদাহরণ—হাঁড়ির মধ্যে হরীতকী রাখিয়া হাঁড়ির মুখে সরা দিয়া সংযোগ স্থল মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ এবং যতক্ষণ অভ্যন্তরস্থ হরীতকী অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং ভঙ্গুর না হয় ততক্ষণ হাঁড়ির নিম্নে অগ্ন্যুত্তাপ প্রদান কর।

না এবং জন্মিয়া থাকিলে ভাল হয়। হরীতকী চূর্ণ অসমান ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে নেত্ররোগ জন্মিতে পারে না এবং দৃষ্টি শক্তি অব্যাহত থাকে।

মুখরোগে--হরীতকী চূর্ণ দিয়া নিত্য দন্ত ধাবন করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্ট সুস্থ থাকে। দন্ত বেষ্টের স্ফীতিতে স্ফীতস্থলের উপর হরীতকী খণ্ড রাখিয়া দিলে স্ফীতি ও যন্ত্রণা নষ্ট হয়। হরীতকী সিদ্ধ উষ্ণ জলের পুনঃ পুনঃ কবল করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্টের শূল নষ্ট হয়। হরীতকী সিদ্ধ জল দ্বারা মুখ ধুইলে এবং মধু সহ হরীতকী চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মুখ, জিহ্বা ও দন্তবেষ্টের ক্ষত নষ্ট হয়।

কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য হরীতকী প্রয়োগ—শাস্ত্রে হরীতকী অনুলোমক বলিয়া কথিত। যে দ্রব্য অপক্ক দোষের পরিপাক এবং বায়ু বন্ধ ভেদ করিয়া মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে অনুলোমক বলে।

মৃদু বা মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে হরীতকী কার্য্যকারী। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলে প্রায়শঃ সুফল পাওয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিশেষত্ব হেতু হয়ত কোন ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিরও বিরেচন হইতে পারে এবং হয়ত কোন মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির নাও হইতে পারে। অন্যান্য হরীতকী অপেক্ষা জঙ্গী হরীতকী অধিকতর ভেদক।

রাত্রিতে শয়ন কালে কোষ্ঠ ভেদে আধ তোলা হইতে দুই তোলা বা ততোধিক মাত্রায় বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে প্রাতে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, অথচ কোনরূপ কষ্টকর উপসর্গ ঘটে না। কোষ্ঠভেদে—প্রাতে খালিপেটে হরীতকী চূর্ণ বা বাটা এক সিকি হইতে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ৩।৪ বার অল্প অল্প করিয়া তরল মল ভেদ হয়। আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে এসম্বন্ধে হরীতকী Kntuow's Powder প্রভৃতি লবণঘটিত বিরেচকের ন্যায় ফলপ্রদ। সুতরাং ঐ সকলের পরিবর্ত্তে হরীতকী চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। খুব প্রত্যূষে পূর্ব্ব কথিত রাত্রের ন্যায় মাত্রায় হরীতকী সেবনে ৩।৪ বার মল ভেদ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন কালে মনে রাখিতে হইবে যে হরীতকী যত বড় ও ভারী হয় ততই ভাল। অধিকন্তু যে হরীতকী ভাঙ্গিলে শস্য স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট এবং সারবান্ দেখা যায় তাহাই উৎকৃষ্ট।

অধিককাল হরীতকী সেবন করিলে পুরুষত্বের হানি হয় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে কিন্তু শাস্ত্রে বা প্রত্যক্ষ ব্যবহারে হরীতকীর ঐরূপ কোন দোষের পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ সংযমী ব্যক্তিরাই হরীতকী ভক্ষণ করেন বলিয়াই এইরূপে অমূলক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শকের মন্তব্য।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ই, হেরল্ড ব্রাউন এম্ ডি, এম, আর, সি, পি, (লণ্ডন) লেপ্টেনাণ্ট কর্ণাল, আই. এম্, এস্ (রিঃ) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিদ্যালয়ের "পরিদর্শকগণের মন্তব্য পুস্তকে" যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নিম্নে তাহার মূল ও অনুবাদ মুদ্রিত হইল—

I have visited with great pleasure the Ayurvedic College which owes its foundation to the energy and enthusiasm of Kabiraj Jamini Bhusan Roy. The object of the institution is the cultivation of the Science of Medicine as taught in Ancient India, with all the advantages and accessories derivable from Modern Science. The Professors will each be in charge of a special subject and will teach his own selected branch both theoretically and practically. Thus we shall have different instructors in Chemistry, Physics, Botany, Physiology, Anatomy, Medicine, Surgery and Midwifery. There will also be an out-door dispensary where professional aid will be available free of charge in Medical and Surgical cases. Arrangements have been commenced for a Museum for Materia Medica so as to facilitate the identification of Medicinal plants. It is also intended to collect manuscripts of rare Ayurvedic works with a view to their publication in correct and reliable editions. I have mentioned a few only of the many striking features of the institution which make it worthy of liberal support from the public as also from the Government. A study of the indigenous system of medicnie, which has successfully maintained its ground against formidable rivals, will convince any impartial critic that its basis was scientific and not empirical ; we cannot consequently afford to ignore a system which embodies the results of the observation and experience of the acutest intellects of India for ages. The right course to follow is, not to treat it as a dead system incapable of further development, but to foster its growth as a progressive science. To achieve this end, ample funds are needed, and one can only express the hope that the requisite funds for a building, a hospital, a library, a museum and a laboratory will not be slow to come.

Sd. ASUTOSH MUKERJEE.

22nd July, 1916.

I had the pleasure of being conducted round the Ayurvedic college this morning, by my friend kaviraj Jamini Bhusan Roy, M. A., M. B.,

I was greatly interested at all I saw, there being indications on all sides of a serious and earnest ende-

avour to impart to the students the principles both of Ayurvedic and western medicine. This I consider a step in the right direction for, though many speak slightingly of the empirical nature of the former, there is not the least doubt that we have much to learn from it. There are a great many indigenous drugs which are of extreme utility, but are little known to the students of western medicine, as they are not taught in the various medical schools; these are being largely employed here, and, among the many interesting and useful collections I saw, was one of growing plants, most of which were familiar to me as useful medicinally and each one was labelled with the vernacular as well as the botanical name.

The anatomical room was well supplied with models and drawings, the Materia Medica room with a large and very varied collection of drugs organic and inorganic and there was also a fair collection of surgical instruments.

The staff is exceptionally strong and as all the members are imbued with a love of their work and a strong determination to overcome all obstacles, the success of the institution is assured.

I am in absolute sympathy with this college, for it meets a distinct want. The Materia Medica of the drugs indigenous to Bengal has been surprisingly neglected. Of late the workers in the past, the last of whom was Dymock of revered memory, did a great deal in that direction.

The modern kabiraj with his wealth of empirical knowledge improved by being taught anatomy and physiology, medicine and surgery, will be amply equipped to practise the science and art of the profession; and I wish the infant institution every success, while heartily congratulating Kabiraj Jamini Bhusan and his keen and intelligent associates on the success they have already attained,

Sd. E. HAROLD BROWN, M, D
M.R.C.P. (London)
Lt. Col. I.M.S. (Retired).

The 7th Sept, 1916.

আমি আয়ুর্ব্বেদ কালেজ পরিদর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। কবিরাজ যামিনী-ভূষণ রায়ের কর্ম্মদক্ষতায় এবং উৎসাহে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আবিষ্কৃত বিবিধতত্ত্ব ও দ্রব্য-সম্ভারের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এক একজন অধ্যাপকের প্রতি বিষয়বিশেষের অধ্যাপনার ভার অর্পিত হইবে। এবং তিনি সেই বিষয়ের শাস্ত্রাংশ যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাই-বেন। রসশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, বনৌষধি-বিজ্ঞান, শারীরক্রিয়াতত্ত্ব, অঙ্গ-বিনিশ্চয়-বিদ্যা, কায়চিকিৎসা, শল্য-শালক্য-চিকিৎসা ও প্রসূতিতন্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যার এই আটটী

শাখার জন্য আটজন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিবেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগিগণের ঔষধসাধ্য এবং শস্ত্রসাধ্য উভয় রোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে নির্ব্বাহ করা হয়। চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত বৃক্ষ গুল্ম লতাদির পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভেষজ পরিচয়াগারের প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দুর্লভ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য বিশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত করাও উদ্যোক্তাদিগের অভিপ্রেত। এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠেয় বিবিধ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের মধ্যে আমি কয়েকটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি বিশেষ হিতকর সুতরাং এই বিদ্যালয় জনসাধারণের এবং রাজ-সরকারের নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য লাভের যোগ্য। ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী সত্বেও এতদ্দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী স্বীয় যশঃপ্রভায় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে কোন নিরপেক্ষ সমালোচক যদি দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে, এই শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরি প্রতিষ্ঠিত, ইহা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ-জ্ঞান-মূলক নহে। ভারতীয় সুতীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন মনীষিগণের যুগযুগান্তরের অর্জ্জিত ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতা যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাকে আমরা কদাপি অবজ্ঞা করিতে পারি না। এক্ষণে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে বলিতেছি—ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ, উত্তরোত্তর উন্নতির অযোগ্য—মৃত বলিয়া ভাবিও না কিন্তু উত্তরোত্তর উপচীয়মান বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত যাহাতে ইহারও পরিপুষ্টি সাধিত হয় যত্নের সহিত তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আশা করা যায়, কালেজের গৃহ, আতুর-নিবাস, গ্রন্থগার, প্রদর্শনী ও কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার জন্য যে অত্যা-বশ্যক অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগৃহীত হইয়া যাইবে। (ইংরাজির অনুবাদ)।

স্বাঃ শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
২২শে জুলাই ১৯১৬।

অদ্য প্রাতঃকালে আমার বন্ধু কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় এম্, এ, এম, বি, আমাকে আয়ুর্ব্বেদ কালেজ দেখাইলেন।

যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চিত্ত সর্ব্বথা আকৃষ্ট হইল। আয়ুর্ব্বেদ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা উভয়ের মূলতত্ত্ব ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল দ্রব্যসম্ভার ও অনুষ্ঠানের আবশ্যক তৎসমুদয় সংগ্রহের জন্য আন্তরিক গুরুতর প্রযত্নের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। এই পদ্ধতিই সম্যক্ উদ্দেশ্য সাধিকা হইবে বলিয়া বিবেচনা করি। অনেকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে কেবল ভূয়োদর্শন জ্ঞান-মূলক বলিয়া কটাক্ষ করিতে পারেন কিন্তু; এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে আমাদের শিক্ষা করিবার যে অনেক বিষয় আছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ উপযোগী—কত দেশীয় গাছ গাছড়া আছে; কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার্থি-গণের এই সকল উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সামান্য। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য অনেক গাছ গাছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই কৌতুহলোদ্দীপক অত্যাবশ্যক

সংগ্রহের মধ্যে আমি কতকগুলি জীবিত বৃক্ষ, গুল্ম, লতা দেখিলাম। ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই সকল উদ্ভিদের অধিকাংশই আমার পরিচিত। প্রত্যেক গাছের বৈজ্ঞানিক নাম এবং বাঙ্গালা নাম লিখিত রহিয়াছে দেখিলাম।

যে গৃহে অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা শিক্ষার দ্রব্য-সম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, সেখানে বিবিধ চিত্র এবং আদর্শ (মডেল্) সুরক্ষিত রহিয়াছে দেখিলাম। ভেষজ পরিচয়াগারে ঔষধার্থ ব্যবহৃত বিবিধ জঙ্গম ও স্থাবর দ্রব্য এবং যন্ত্রশস্ত্রাগারে বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

অনুষ্ঠাতৃগণের বিশেষ যোগ্যতা আছে। অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি ইঁহাদের সকলেরই আন্তরিক অনুরাগ আছে এবং ইঁহাদের সকলেই সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; সুতরাং এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে সুনিশ্চিত সেপক্ষে সন্দেহ নাই।

বহুপূর্ব্বে কতিপয় কর্ম্মিপুরুষ ভারতের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্মরণীয় কীর্ত্তি ডাইমকের পর আর কেহই এদিকে শ্রমস্বীকার করেন নাই। এক্ষণে বঙ্গদেশ সুলভ গাছগাছড়ার গুণাদি-তত্ত্বের আলোচনা এতাদৃশ অবজ্ঞাত হইয়াছে যে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বিদ্যালয়ে সেই বহুদিনের অবজ্ঞাত দ্রব্যগুণ বিদ্যার পুনরালোচনার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্যে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ভূয়োদর্শন-জাত-অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক আধুনিক আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসক, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা, শারীর-ক্রিয়াবিজ্ঞান, কায়-শল্য-শালাক্য চিকিৎসায় সুশিক্ষিত হইলে তাঁহারা ভিষক্‌বিদ্যায় সুনিপুণ এবং যুগোপযোগী সুচিকিৎসক বলিয়া আদৃত হইবেন। আমার আন্তরিক কামনা, এই অচিরপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যা-লয়ের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হউক। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এবং তাঁহার কার্য্যানুরক্ত সুবুদ্ধি সহযোগিগণ এই শুভানুষ্ঠান কার্য্যতঃ নির্ব্বাহের পক্ষে যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। (অনুবাদ)

স্বাঃ ই, হেরল্ড ব্রাউন, এম, ডি, এম, আর, সি পি, (লণ্ডন) লেপ্টে; কর্ণেল, আই, এম, এস্ (রিঃ)।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬।

অগ্রহায়ণের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরাজ এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। ১৫ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই কলম		৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক	,,	৪॥০
,,	সিকি ,,	,,	আধ	,,	২৸০
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি	,,	১॥০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ

২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়"

২৯. ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
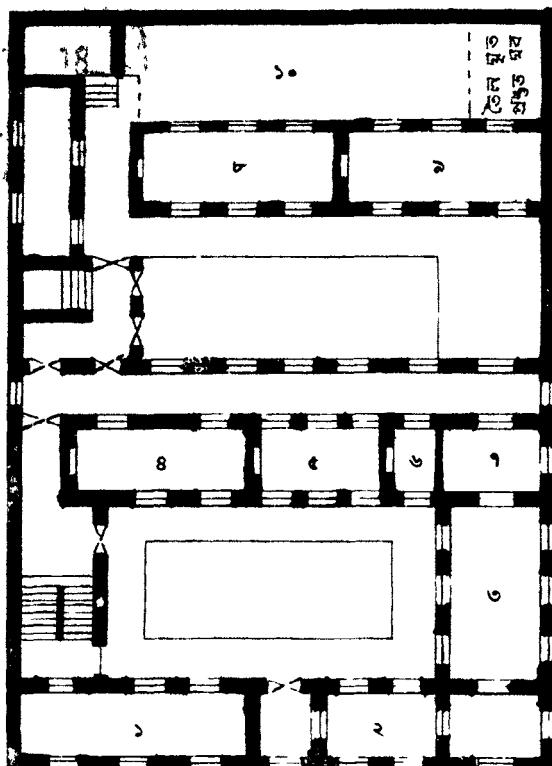
এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। { বঙ্গাব্দ ১৩২৩—পৌষ। { ৪র্থ সংখ্যা।
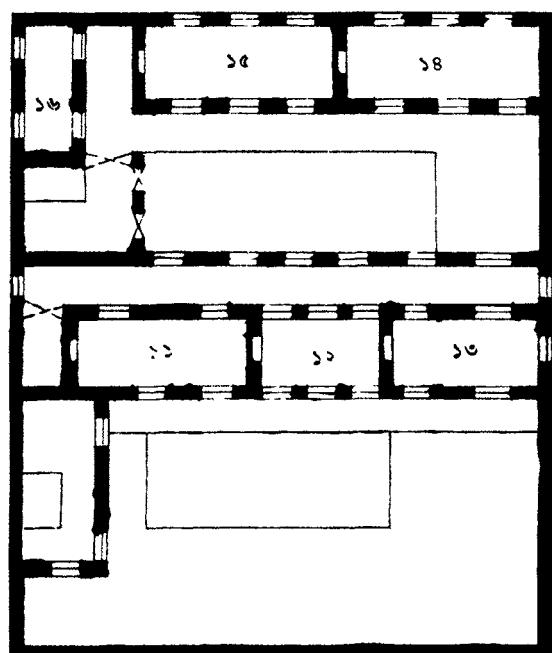
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

এক্ষণে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কি সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় প্রদান করিব। আয়ুর্ব্বেদ আটটী অংশে বিভক্ত বলিয়া উহা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ নামে বিখ্যাত। আটটী অঙ্গ যথা, কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র। প্রত্যেকের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

১। কায়তন্ত্র—জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ-সাধ্য যাবতীয় রোগের চিকিৎসা এই তন্ত্রমধ্যে নিবিষ্ট আছে। কায়তন্ত্র আজিও আয়ুর্ব্বেদের প্রাবল্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অবশ্য যাঁহারা কবিরাজীকে "হাতুড়ে" চিকিৎসা বলিয়া মনে করেন অথবা বিংশশতাব্দীর এই নিত্য নূতন উন্নতির যুগে সেই বহু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় গ্রহণ করা স্বীয় বিদ্যাবত্তার লাঘব বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা—আয়ুর্ব্বেদের কায়-চিকিৎসা কিরূপ ফলপ্রদ তাহা জানিবার অবকাশ তাঁহাদের কখন ঘটিবে না। কিন্তু এইরূপ কতকগুলি লোক ব্যতীত ভারতের আপামর সাধারণ এবং অধুনা অনেক বৈদেশিক ব্যক্তি জীর্ণ জটিল রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কায়তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উৎকর্ষ সম্বন্ধে "আয়ুর্ব্বেদে" ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে আমরা কেবল কায়তন্ত্রে কি কি বিষয় আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

রোগ সম্বন্ধে- রোগোৎপত্তির কারণ, রোগনির্ণয়, বিভিন্ন রোগের নিদান উপসর্গ ও অরিষ্ট, অজ্ঞাত রোগ জ্ঞানের উপায়, রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়, লঘু ও গুরু ব্যাধি নির্ণয়, সন্তর্পণ ও অপতর্পণজাত রোগ, জনপদোধ্বংস, রোগের প্রাকৃতাদি ভেদ প্রভৃতি।

রোগী সম্বন্ধে—রোগীর গুণ, রোগি-শুশ্রূষা রোগি-পরীক্ষা, রোগীর প্রকৃতি, সত্ত্ব, সাত্ম্য, প্রভৃতি।

পথ্য সম্বন্ধে—বিবিধ রোগে নানা প্রকার

পথ্যের কল্পনা, হিতাহিত বিচার, মাত্রা, সংযোগবিরুদ্ধত্ব ইত্যাদি।

ঔষধ সম্বন্ধে—ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ দ্রব্যের গুণ, উৎকর্ষ পরীক্ষা, নানা প্রকার ঔষধ কল্পনা ও তাহাদের প্রয়োগক্ষেত্র, ঔষধের মাত্রা, ঔষধপ্রয়োগের কাল প্রভৃতি।

চিকিৎসা—চিকিৎসার মূলসূত্র ও যোজনাবিধি, ভেষজ, ক্ষার ও অগ্নি-প্রয়োগ, স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, নিরূহ, অনুবাসন, ধূম, নস্য, কবল, আশ্চ্যোতন প্রভৃতির প্রয়োগ।

সুস্থব্যক্তি সম্বন্ধে—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, রোগ প্রতিষেধের উপায়, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, সদাচারবিধি প্রভৃতি।

২। শল্যতন্ত্র—(Surgery) যন্ত্র শস্ত্র জলৌকা, ব্রণবন্ধন, শস্ত্রসাধ্য রোগ, শল্যনির্হরণ প্রভৃতি বহুবিধ তথ্যের আকর। ধাত্রী বিদ্যা (Midwifery) শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, শল্যতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর অভিভাষণে দ্রষ্টব্য।

শালাক্যতন্ত্র—গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশস্থ রোগসমূহের অর্থাৎ শ্রবণ, নয়ন, বদন ও শিরোগত রোগের লক্ষণাদি এবং উহাদিগের চিকিৎসাব উপদেশ শালাক্যতন্ত্রের বিষয়ীভূত।

ভূতবিদ্যা - ইহা মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ। কতকটা Spiritualismও বটে।

কৌমার ভৃত্য—কুমারদিগের লালনপালন এবং তাহাদিগের রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ কৌমারভৃত্য তন্ত্রের বিষয়ীভূত।

অগদতন্ত্র—নানাপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম বিষের পরিচয়, ভিন্ন ভিন্ন বিষ-পীড়িতের লক্ষণ এবং তাহার চিকিৎসা অগদতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

রসায়ন—দীর্ঘজীবন, দীর্ঘ যৌবন, বল, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য সুস্থব্যক্তিকে যে ঔষধ সেবনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাই রসায়ন তন্ত্রের অভিধেয়।

বাজীকরণ তন্ত্র—ভোগসুখকর, অপত্য বর্দ্ধনকর ঔষধসমূহ বাজীকরণ তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের গৌরবের বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইল। পরে আমরা আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রত্যেক বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গত নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্যকসম্মেলনের সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া এবং তাঁহার সেই অভিভাষণ "আয়ুর্ব্বেদে" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমরা বাহুল্য বিবেচনায় তাহা হইতে নিবস্ত হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করা যে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি উপায়ে উহার পুনরুদ্ধার ঘটিতে পারে এ সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই চিন্তা করিতেছেন—ইহা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের কথা। আমরাও এ সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করিব।

এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত যে তাদৃশ চেষ্টার উপযুক্ত কাল আসিয়াছে কি না? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে "বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষ কোটয়ঃ" অর্থাৎ কালে একটী আহুতি দিলে যে ফল হয়, অকালে লক্ষ কোটি আহুতিতে সে ফল হয় না। কালে বীজ বপন করিলে শস্য জন্মে, অকালে বপন করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

নানা দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, কালে ক্ষুদ্র চেষ্টা বলবতী হইয়া মহাফল প্রসব করিয়াছে। আবার অকালে মহতী চেষ্টাও স্বল্পমাত্র ফল উৎপাদন করিতে পারে নাই। সেই জন্য প্রথমেই দেখা উচিত যে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারকল্পে চেষ্টার কাল আসিয়াছে কি না?

পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা অনুকূল সমাধানের আভাস পাওয়া যায়। কারণ বহুকালের অবনতির পর অধুনা ভারতে একটা উন্নতির যুগ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতে এক্ষণে নানা প্রকার কল কারখানা স্থাপনের জন্য একটা বিরাট চেষ্টা চলিতেছে। টাটা আয়রণ ওয়ার্কস্ তাহারই একটী মধুময় ফল। সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন জন্য আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এবং অনেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি মুক্ত হস্ত হইয়াছেন এবং তাহার ফলে সংস্কৃত চর্চ্চা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যাহা ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শস্ত্র অজ্ঞ নরসুন্দরের হস্ত হইতে শিক্ষিত ডাক্তারের হস্তে স্থান পাইয়াছে। অধিক কি, ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া আখ্যাত বাঙ্গালী যুবক আজ য়ুরোপের মহাসমরে যোগদান করিয়া বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘুচাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উন্নতির যুগে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে দেখা উচিত যে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের উপায় কি? বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদের যতটুকু পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। অপিচ, যাহা পাওয়া যায় তাহাও সকলে বুঝেন বলিয়া মনে হয় না।

"যাহা পাওয়া যায় তাহা সকলে বুঝেন বলিয়া মনে হয় না" এই কথায় অনেকে ক্রুদ্ধ হইবেন। কিন্তু কথাটী যে অতি সত্য তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। চরকের শারীর স্থানে গর্ভস্থিত ভ্রূণ "উপস্নেহ" ও "উপস্বেদ" দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এইরূপ লিখিত আছে। এই উপস্নেহ ও উপস্বেদের স্পষ্টার্থ কি?

শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে :—

ব্যপগতপিপাসাবুভুক্ষস্তু গর্ভঃ পরতন্ত্র বৃত্তির্মাতরমাশ্রিত্য বর্ত্তয়ত্যুপস্নেহোপস্বেদাভ্যাম্। গর্ভস্তু সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়ব স্তদনন্তরং হ্যস্য লোমকূপায়নৈরুপস্নেহঃ কশ্চিন্নাভিনাড্যয়নৈঃ। নাভ্যাং হ্যস্য নাড়ী প্রসক্তা নাড্যাঞ্চামরামরা চাস্য মাতুঃ প্রসক্তা হৃদয়ে. মাতৃহৃদয়ং হ্যস্য তামমরা মভিসংপ্লবতে সিরাভিঃ স্যন্দমানাভিঃ। স তস্য রসো বলবর্ণকরঃ সম্পদ্যতে।

অনুবাদ :—ভ্রূণ ক্ষুৎপিপাসা রহিত ও পরতন্ত্র হইয়া মাতাকে আশ্রয় করিয়া উপস্নেহ ও উপস্বেদ দ্বারা জীবিত থাকে। সদসদ্ভূতাঙ্গাবয়ব (কোন অঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে এবং কোন অঙ্গ প্রকাশ পায় নাই এরূপ) গর্ভ —লোমকূপের দ্বারা উপস্নিগ্ধ হয়, কখন বা নাভিনাড়ী দ্বারা পুষ্ট হয়। ভ্রূণের নাভির সহিত যে নাড়ী সংলগ্ন থাকে তাহাকে অমরা বলে, অমরার এক প্রান্ত মাতার হৃদয়ের সহিত সংলগ্ন থাকে। মাতার হৃদয় সংলগ্ন সিরা রসদ্বারা অমরা নাড়ীকে আপ্লুত করে। সেই রস দ্বারা ভ্রূণের বল বর্ণ জন্মে।

এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে মাতার নাভিনাড়ী ও লোম-কূপ দ্বারা গর্ভ পুষ্ট হয়, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু স্পষ্টার্থ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে টীকাস্বরূপ য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের

ঋতু শোণিত স্থিত ডিম্ব (ovum) শুক্রস্থিত স্পারম্যাটোজোয়া (Spermatogoa) কর্তৃক বিদ্ধ বা আহত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হইলে তখন উহা রস শোষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাকে উপস্নেহ (Subcutaneus absorption) বলা যায়। কিন্তু গর্ভ চিরদিন এইরূপ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। জরায়ুর মধ্যে অমরা (Placenta) উৎপন্ন হইলে সেই অমরার ভিতর দিয়া মাতার রস ভ্রূণ শরীর পোষণ করিয়া থাকে। এই রস কিরূপে মাতার শরীর হইতে গর্ভের শরীরে প্রবেশ করে? আমাদের ফুস্ ফুসে যেরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত বায়ুস্থিত অম্লজান (Oxygen) গ্রহণ করে এবং স্বীয় দূষিত অংশ বায়ুতে মিশাইয়া দেয় সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা একটা খুব পাতলা পর্দ্দার ভিতর দিয়া এইরূপ বিনিময় ঘটে। ইংরাজীতে ইহাকে অস্‌মসিস্ (Osmosis) বলে।

উপরি লিখিত বিষয়ের জন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব মল্লিক এম্ বি, মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি উপস্বেদের অর্থ Absorption through the Skin এবং উপস্নেহের অর্থ Absorption by osmosis লিখিয়াছেন। কিন্তু মূলে "লোম কূপায়নৈরুপস্নেহঃ" পাঠ থাকায় আমরা উপস্নেহ শব্দের অনুবাদ Absorption Through the Skin করিতে বাধ্য হইয়াছে। উপস্বেদ অর্থে "Absorption by osmosis" কিনা তাহা বিচার্য্য।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলে আমরা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রাংশ অতি সহজে বুঝিতে পারি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে এমন অনেক বিষয় আছে যাহার সহিত য়ুরোপীয় চিকিৎসার সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যায়। এরূপ স্থলে আমরা পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত গ্রহণ না করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মতকেই অভ্রান্ত মনে করিব। এবং সেই মত যে অভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য জীবনের পর জীবন উৎসর্গ করিব। গুপ্ত সত্য একদিন অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার কল্পে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার—আয়ুর্ব্বেদীয় অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের প্রচার। বিশাল ভারতবর্ষে কত দেশে কত অসংখ্য গ্রন্থ গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে পারিলে অনেক অজ্ঞাত বিষয় সহজেই আমরা জানিতে পারিব, আয়ুর্ব্বেদের অনেক রহস্য সহজেই বুঝিতে পারিব।

গ্রন্থানুসন্ধান, গূঢ়শাস্ত্রার্থের সদ্ব্যাখ্যা, উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে অধ্যাপনা, বৈদকবৃক্ষ বাটিকা প্রতিষ্ঠা আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্বগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায় বটে কিন্তু যেরূপ ভাবেই উন্নতির চেষ্টা করা যাউক নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় সফলতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

১। রাজানুগ্রহ।

২। চিকিৎসকগণের একতা।

৩। জন সাধারণের অর্থ সাহায্য।

রাজানুগ্রহ :—আমাদের সদাশয় সম্রাট এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ নানা প্রকারে ভারতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতে-

ছেন। তাঁহাদের কৃপায় কত লুপ্ত শিল্প পুনর্জীবিত হইয়াছে; কত লুপ্ত-বিদ্যা সুপ্রচারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের ভাগ্যে আজিও তাদৃশ রাজানুগ্রহ লাভ ঘটে নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সমস্ত ভারতবাসী একযোগে যদি রাজার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে কখনই সদাশয় সম্রাট আমাদের মনঃক্ষুণ্ণ করিবেন না। এস ভাই, আমরা সকলে রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলি :—

হে রাজরাজেশ্বর, হে রাজন্য-মৌলিমণি-মণ্ডিত পাদ পীঠ, আজ আমরা কাতর হৃদয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আয়ুর্ব্বেদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করুন। ভারতের সকল শাস্ত্রই রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছে, কিন্তু কোন অপরাধে আয়ুর্ব্বেদ সে অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে প্রভু! আপনার কৃপা-কটাক্ষ পাত হইলে আয়ুর্ব্বেদ আবার সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া রোগার্ত্তজনগণের রোগাপনয়ন করিয়া ভারতবাসীকে সুস্থ সবল করিতে সক্ষম হইবে। এই সদুদ্দেশ্যে সহায়তার জন্য ভারতবাসী আপনার মুখ চাহিয়া আছে। হে রাজচক্রবর্ত্তী কৃপা-কটাক্ষপাত করুন।

২। চিকিৎসক গণের একতা :—একতার অভাব বঙ্গদেশের অনুন্নতির একটী প্রধান কারণ। চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও একতার বিশেষ অভাব। কবিরাজে কবিরাজে এবং ডাক্তার কবিরাজে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। কিছু কাল পূর্ব্বে ডাক্তারগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু সুখের বিষয় আজ কাল অনেকের সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। অনেকে আজ কাল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধকে আদর করিতেছেন। ইম্পেরিকেল অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের যে কলঙ্ক ছিল তাহা এক্ষণে প্রায় লোপ পাইয়াছে। আমরা আমাদের পরম প্রীতি-ভাজন ডাক্তার ভ্রাতাদিগকে আমাদের এই জাতীয় গৌরব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করে সহযোগী হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আর হে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এখন আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। ব্যবসার ক্ষেত্রে তুমি আমার প্রতীদ্বন্দ্বী, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে ভাব তুমিও ত্যাগ করিতে পারিবে না, আমিও পারিব না। কিন্তু এস আমরা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় রূপ গণ্ডী নির্ম্মাণ করি। আমরা যখন সেই গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিব, তখন আমরা আর "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নাই" তখন আমরা "বয়ং পঞ্চ শতানি চ।" সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ রাবণ, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের ঐকান্তিকী একনিষ্ট ইচ্ছারূপিণী পতিব্রতা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া আবার তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। এস ভাই আর বিলম্ব করিও না. অনেক সময় অপব্যয় করিয়াছি; আর নয়, ঐ দেখ, আয়ুর্ব্বেদের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত আত্রেয় ধন্বন্তরির স্বর্গগত আত্মা আমাদেরই মুখ পানে চাহিয়া আছে।

৩। আর হে ভারতীয় জনসাধারণ, আজ আমরা তোমাদের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ তোমাদের, আয়ুর্ব্বেদ তোমাদের জীবন স্বরূপ, তোমরা আয়ুর্ব্বেদের, তোমরা আয়ুর্ব্বেদের জীবন

স্বরূপ। দাও ভাই ভিক্ষা দাও, ক্ষীণ প্রাণ কঙ্কাল সার আয়ুর্ব্বেদকে পুনরুজ্জীবিত এবং পুষ্ট করিবার জন্য ভিক্ষা দাও ভাই। ভিক্ষুক তোমার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল হইতে একমুষ্টি দাও, কৃষিজীবী তোমার ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে একসের শস্য দাও, গৃহস্থ তোমার বাজার খরচের পয়সা হইতে একটী পয়সা দিয়া যাও, ধনী তোমার ধন ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য কর, বিলাসী তোমার বিলাসিতার জন্য ব্যয়ের শতাংশ দাও, রাজা মহারাজা, নবাব, জমিদার তোমরা কৃপা-কটাক্ষপাত কর। আর মা বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ, তোমাদের বস্ত্রাভরণের সহস্রাংশ দান কর। মনে করিও না, এ দান বৃথায় যাইবে। আয়ুর্ব্বেদ শত সহস্রগুণ দিয়া তোমাদের এ ঋণ পরিশোধ করিবে। আয়ুর্ব্বেদ এমন একটী ফল, মূল বা পত্রের কথা তোমায় বলিয়া দিবে যদ্দ্বারা তুমি কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে, তোমার রুগ্নপত্নী সুস্থ হইবে, তোমার মৃতপ্রায় পুত্র পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। আর হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বদর্শী মঙ্গলালয় জগদীশ, তুমি একবার আয়ুর্ব্বেদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর। আয়ুর্ব্বেদ ধন্য হউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশুর সর্দ্দি ও কাস চিকিৎসা।

(লীলা ও ছোট বৌ)।

ছোট বৌ। ঠাকুরঝি কখন এলে ?

লী। এই আস্‌ছি ভাই।

ছো। বাড়ীর সব খবর ভালত ?

লী। খবর ভাল হলে আর এই অসময়ে ছুটে আসি।

ছো। কেন কি হয়েছে ?

লী। এই ছেলে দুটোর অসুখ ভাই। ঠাক্‌মা কোথায় জানিস্ ?

ছো। ঠাক্‌মা ঠাকুর ঘরে পূজো আহ্নিক কর্‌ছেন্ এখনই আস্‌বেন।

লী। (নিরীক্ষণ করিয়া) ওমা একি ?

ছো। (বিস্ময়ে) কি ঠাকুরঝি ?

লী। তুই কি আজ কোন মজলিসে নাচতে যাবি নাকি ?

ছো। নাচতে যাব কি গো !

লী। পরনে ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড়, পায়ে ঘুমুর দেওয়া মল, গায়ে পাতলা ফিন্‌ফিনে বডিস—বুকের অর্দ্ধেকটা খোলা, তার ওপর পাতলা বাহার দেওয়া ওড়না, মুখে পাউডার মেখেছিস্, ব্লুম অফ্ রোজ (Bloum of rose) দিয়ে গাল রাঙা করেছিস্—এত নাচের পোষাক।

ছো। তবু ভাল।

লী। তবু ভাল কি ?

ছো। এতে আর কি দোষ হল ?

লী। এতে আর কি দোষ হল ! গেরস্তর বউ, এই পোষাকে কোথায় যাবি শুনি ?

ছো। চন্দ্র ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ী নেমন্তন্ন।

লী। বলি কিসের নেমন্তন্ন, নাচনার না খাবার ?

ছো। নাচবার আবার কি ঠাকুরঝি, খাবার।

লী তবে এ নাচওয়ালীর পোষাক পরে কেন যাচ্ছিস্?

ছো। ভাল পোষাক পর্‌তে কি ইচ্ছা হয় না?

লী। ভাল পোষাক পর্‌তে কে তোকে বারণ কর্‌ছে। কিন্তু তুই গেরস্তর বউ, চল্‌তে ফির্‌তে তোর মল রুণু ঝুণু করে বলবে—"ওগো আমায় দেখ গো।" লোকের মন হরণ কর্‌বার জন্যে অসতী স্ত্রীলোকেরা পাউ-ডার, ব্লুম অফ্ রোজ মেখে রূপ বাড়ায় আর লোককে মুগ্ধ কর্‌বার জন্য অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখবে বলে পাতলা কাপড় গায়ে দেয়। তুই কার মন হরণ করতে চলেছিস্, কাকে মুগ্ধ কর্‌তে যাচ্ছিস্?

ছো। তা আজ কালই সবাই—

লী। রেখে দে তোর সবাই। যদি কোন নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক নাচওয়ালীর মত পোষাক পরে বেরোয় তবে কি সবাই তাই কর্‌বে।

ছো। তা মেমেরাওত কত রকম সেজে গুজে বেরোয়।

লী। তুই কি মেমেদের দেশে জন্মেছিস্ না মেমেদের সমাজে মিশেছিস্ যে মেমেদের মত চল্‌বি। মেমেরা অখাদ্য খায়, তুই খেতে পারিস্ মেমেদের অনেকবার বিয়ে হয়, তোর হতে পারে?

(ঠাকুমার প্রবেশ)

ঠা। এই যে লীলা এয়েছিস্। কিসের ঝগড়া হচ্চে তোদের?

লী। এই তোমার ছোট নাতবৌ নেম-ন্তন্ন খেতে বড়দার শ্বশুর বাড়ী যাচ্চে, তা পোষাকটা দেখ একবার।

ঠা। তাইত এই পোষাক পরে লোকের কাছে বেরুবি কি করে ছোট?

ছো। তা আজ না হয় যা—

লী। চোপ্‌রাও কালামুখী। জানিস্ আমি তোর ননদ, কখন যদি এমন পোষাকে বাড়ীর বার হতে দেখি কি কোন গুরুজনের সুমুখে বেরুতে দেখি, এক কিল মেরে তোর দাঁত দুপাটি ভেঙে দেব। যদি একান্ত এ রকম সাজ্‌বার ইচ্ছা হয়, যার মনোরঞ্জন করা তোর দরকার—সেই স্বামীর কাছে এই রকম সেজে বসে থাকিস্। যা এখন এ কাপড় ছেড়ে ভাল মোটা কাপড় পরে আয়, ও বুক খোলা বডি রেখে বুক চাপা বডি পরে আয়, মোটা সাদাসিদে ওড়্না গায়ে দিয়ে আর মল খুলে রেখে আয়।

(ছোট বধুর প্রস্থান)

লী। এ রকম কেন হল ঠাকুমা?

ঠা। যুগধর্ম্ম—কালধর্ম্ম, তা বৈ আর কি বল্‌ব। প্রাচীনকালের কথা ছেড়ে দাও। বাল্যকালে আমরা দেখেছি—একখানা মোটা কাপড় আর চাদরের মধ্যে একটা দেবতার মত হৃদয় ছিল, সে হৃদয় সংযম, আত্মত্যাগ, সর্ব্বভূতে দয়া নিষ্ঠা, দেব দ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণে পূর্ণ ছিল। একখানা মোটা লালপেড়ে সাড়ী আর দুগাছা শাঁখার মধ্যে একটা অশেষ সদ্‌গুণপূর্ণ মাতৃত্বপূর্ণ হৃদয় ছিল। আর এখন দেখি কি—জুতা, ষ্টকীন, মিহিধুতি, সার্ট, কোট, চেন ঘড়ির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র স্বার্থ-পর হৃদয়, জামা সেমিজ বডিস, মিহিসাড়ী ও অলঙ্কারের মধ্যে একটা স্বার্থপর অনন্ত লালসা-পূর্ণ নিষ্ঠুর হৃদয়। হায় হায় কি অধঃপতন!

লী। শুধু তাই নয় আগেকার লোক নাকি অসভ্য ছিল, আর এখনকার লোক নাকি সভ্য।

ঠা। তাই যদি হয় তবে ভগবানের নিকট

প্রার্থনা করি এই অসুখ অশান্তিপূর্ণ সভ্যতার পরিবর্ত্তে দেশে আবার সেই সুখশান্তিপূর্ণ অসভ্যতা ফিরে আসুক। নারায়ণ, নারায়ণ পার কর প্রভু!

লী। সে জন্যে ভাব্‌তে হবে না ঠাক্‌মা, প্রভু এপারে বড় কাউকে রাখেন না সকলকেই দয়া করে ওপারে নিয়ে যান। এখন তুমি পার হবার আগে আমায় পার করে দাও।

ঠা। কেন আবার কি হল তোর?

লী। এই ছোট খোকার কাসি আর বড় খোকার সর্দ্দি।

ঠা। ছোট খোকার কি রকম কাসি?

লী। ওঃ! সে ভয়ানক কাসি। যখন হয় সহজে থামে না অনেকক্ষণ ধরে হয়। আর কাস্‌তে কাস্‌তে ছেলেটা নির্জ্জীব হয়ে পড়ে।

ঠা। কত দিন হয়েছে?

লী। সূত্রপাত আট দশ দিন আগে থেকে। প্রথমে সর্দ্দি হয়েছিল একটু একটু কাসিও ছিল। আজ তিন দিন এই রকম বেড়েছে।

ঠা। এর মধ্যে কিছু ওষুদ দিস্‌নি?

লী। বেশী কিছু নয় কেবল দুধের সঙ্গে পিপুল সিদ্ধ করে দিতাম। হাঁ ভাল কথা কাল আমার বড় নন্দাই এসেছিলেন। তিনি একজন ভাল ডাক্তার। তিনি বেশ করে দেখে শুনে বল্লেন যে একে হুপিং কাসি বলে। এ রোগের ওষুদ বড় কিছু নেই। কিছুদিন বাদে আপনিই সেরে যাবে।

ঠা। রোগ মাত্রেরই ওষুদ ভগবান সৃষ্টি করেছেন। ওষুদের অভাব নেই, অভাব জ্ঞানের। জ্বর হয় না ত?

লী। বেশ স্পষ্ট জ্বর হয় না তবে মাঝে মাঝে গা গরম বলে বোধ হয়।

ঠা। হুঁ ঘুংড়ি কাসি হয়েছে। বাহ্যে কেমন হয়?

লী। বাহ্যে খুব কঠিন। প্রায় একবার কবেই হয়। একদিন কেবল হয় নি।

ঠা। খেতে দিচ্চিস্‌ কি?

লী। ভাত দিইনে, দুধ, রুটী, বার্লি, মিছরী, বেদানার রস এই সব দিই।

ঠা। কফ ওঠে কিছু?

লী। বেশ ওঠে না। কাস্‌তে কাস্‌তে একটু আধটু ওঠে। তা প্রায়ই গিলে ফেলে, কখন হক করে ফেলে দেয়—যেন জিওলের আটা।

ঠা। বলি শোন। এর কফ একটু বসে গিয়েছে, কাজেই কফ যাতে সরল হয়ে উঠে যায় এমন ধারা ওষুদ আর পথ্যি দিতে হবে। দুধ আগেই বা কত খেত আর এখনই বা কতটুকু দিস্‌?

লী। আগে একসের পাঁচ পোয়া খেত এখন আধসের আড়াই পোয়া দিই।

ঠা। হাঁ তাই দিস্‌, আর পিপুল দিয়ে সিদ্ধ করে মিছরী দিয়ে দিস। যদি পাওয়া যায় তাহলে গাইয়ের দুধ না দিয়ে ছাগল দুধ দিস্‌। সব না পেলেও যতটা পাওয়া যায় দিবি আর বাকী গাইয়ের দুধ দিবি। ছাগল দুধ শুক্‌নো কাসি আর পেটের অসুখের পক্ষে বড় ভাল।

লী। আচ্ছা তাই দেব। কিন্তু মিছরী কি সবই দুধের সঙ্গে দেব?

ঠা। তা দিবি বৈ কি। মিছরীতে কফ বড় সরল করে। তবে আকের চিনির মিছরী যোগাড় করতে হবে। সেটা পাওয়া আজ কাল দুর্ঘট হয়েছে।

লী। তবে বাজারে যে মিছরী পাওয়া যায় ও কি থেকে তৈয়ের?

ঠা। ও বিটের চিনির মিছরী। কাসির সময় দিশী চিনির মিছরী গলায় রাখ্‌লে স্বস্তি হয়, বিটের চিনির মিছরী রাখ্‌লে তেমন হয় না।

লী। তা সে আবার কোথায় পাব ?

ঠা। কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা আমি জানিনে, তবে আমরা প্রায় ভাট পাড়া থেকে আন্‌তাম। সেখানে পাড়ার ভেতর-কার ময়রারা গুড় থেকে চিনি মিছরী তৈয়ের করে।

লী। তা আমি কালই চাকর পাঠিয়ে দিয়ে আনাব। আচ্ছা ভাল কথা তালের মিছরী দিলে হয় না ?

ঠা। তালের মিছরী বলে যে গুলো বিক্রী হয় ও গুলো ত এদেশে হয় না, চীন দেশ থেকে আসে। অনেক লোক, এমন কি ডাক্তার কবিরাজ ওগুলো ব্যবহার করেন, কিন্তু লোকনাথ বদ্দি বলতেন যে ওগুলো কিসে থেকে হয় যখন জানিনা তখন ও ব্যবহার কর্‌বোনা। তিনি দিশি চিনির মিছরীই ব্যবহার কর্‌তেন।

লী। তা এদেশে এত তাল গাছ তবু মিছরী হয় না কেন ?

ঠা। দেশের লোকের কি সে চেষ্টা আছে। তা না হলে দেশে যে তাল গাছ আছে তা থেকে গুড় মিছরী তৈয়ের কর্‌বার ব্যবসা করলে লোকে বড় লোক হতে পারে, দেশেরও একটা অভাব দূর হয়।

লী। তালের গুড় কিন্তু তৈয়ের হয় ঠাক্‌মা।

ঠা। সে জায়গায় জায়গায় হয় বটে— খুব সামান্য।

লী। যাক্‌ সে কথা, আর কি দেব বল।

ঠা। বাহ্যে যখন ভাল হয় না তখন খৈ দুধ দেওয়াই ভাল। খৈ যেন টাট্‌কা হয় আর লাল কাঁচুলি ("খৈ চড়া") না থাকে।

লী। তা লাল লাল কাঁচুলিত সব খৈতে থাকে।

ঠা। না সব খৈয়ে থাকে না। ভাল ধানের খৈ বেশ সাদা ধপ্‌ ধপে হয়। যদিও বা থাকে সে এত কম যে ধর্ত্তব্য নয়।

লী। রুটী দেবো না ?

ঠা। দেখ কাসির পক্ষে লঘু পথ্যই ভাল রুটী একটু গুরুপাক, সেই জন্যে না দেওয়াই ভাল। তবে যদি ছেলে না রাখতে পারিস্‌ তা খুব পাতলা সুজির রুটী ২।১ খানা দিবি।

লী। সুজির রুটী কি করে করবো ?

ঠা। চারটী ভাল সুজি নিয়ে গরম জলে চটকে শক্ত ডেলার মত করবি। তার পর ফুটন্ত জলে সেই সুজির ডেলাটা দশ মিনিট সিদ্ধ করবি। তারপর তুলে নিয়ে দরকার মত অল্প দুটি সুজি মিশিয়ে খুব পাত্‌লা পাত্‌লা রুটী করবি।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা পাঁউরুটী দেওয়া যায় না ?

ঠা। পাঁউরুটী টা আমাদের দেশে চলে গেছে, আর ওটা যখন ময়দা থেকে তয়ের হয় তখন দিতে বাধা নেই। তবে অনেক সময় খারাপ ময়দায় তয়ের হয়, ধুলো বালি মেশে সেইজন্য খুব ভাল না পাওয়া গেলে দিতে নেই।

লী। আর যদি ভাল পাওয়া যায়।

ঠা। তা হলে আগুণে সেকে দিতে হয়। পাউরুটী টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে একটা খুন্তীর আগায় বিঁধে আগুণের ওপর ধরতে হয় সে দিকটা কটা রঙ্গের হয়ে গেলে আর এক পিট অমনি করে সেঁকতে হয়। যদি একটু

আধটু পুড়ে ওঠে সেটুকু ছুরি দিয়ে চেঁচে ফেল্‌তে হয়।

লী। তারপর বার্লি দিতে পারি ?

ঠা। হাঁ দরকার হলে বার্লি দিতে পার।

লী। জল খাবার কি দেব ?

ঠা। কিসমিস, খেজুর, মনকা, দাড়িম, কুমড়োর মেঠাই, দু'চারটে এলাচ দানা একটু মিছরী।

লী। একটু দাল তরকারি কি মাছের ঝোল খেতে চায়, তার কিছু দিতে পারি কি ?

ঠা। এটা হলো বাতিক কাস, এতে বেতোশাক, কাকমাচী (গুড় কামাই) শাক, কচি মূলো, মাষ কলায়ের যুষ, মাছের ঝোল এ সব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কচি ছেলে —এত না দিয়ে একটু খলশে, শিঙ্গি কি মাগুর মাছের ঝোল দিস্‌।

লী। আচ্ছা তুমি ভিন্ন ভিন্ন কাস্‌ কি করে বোঝা যায় ? আর কিসে কি রকম পথ্যি দিতে হয় একটু শিখিয়ে দাও।

ঠা। আচ্ছা মোটামুটি বল্‌ছি শোন। বাতিক কাসে মুখ, গলা, বুক শুকিয়ে উঠে, বুক, পাঁজর ও মাথার যন্ত্রণা হয়, খুব শুক্‌নো কাসি হয়, কফ খুব কম ওঠে। বাতিক কাসের পথ্যির কথা আগে বলিছি তা ছাড়া মাংসের যুষ, টক ফল, দই, আক এ সব অবস্থা বুঝে দেওয়া যায়। পিত্তকাসে চোখ আর কফ হল্‌দে হয়, প্রায় একটু জর হয়, তৃষ্ণা হয়, বমি হয় আর গায়ের জ্বালা হয়। এতে মুগের যুষ, বার্লি, বার্লির রুটী তেতো শাক, কিস্‌মিস, খেজুর, চিনি, খৈ এই সব পথ্য দিতে হয়। কফকাসে বুক খুব ভার হয়, গলায় যেন কি লেপা রয়েছে বোধ হয়, অরুচি হয়, বমি হয়, ঘন শাদা শ্লেষ্মা খুব বেরোয়। এতে বার্লি, যবের রুটী, মধু, খৈ, কুলথি কলায়ের যুষ, কচি মূলা, রুক্ষ, ঝাল, আর গরম জিনিষ পথ্য দিতে হয়। পিত্ত ও কফ কাসে মাছটা দেওয়া ভাল নয়।

লী। এখন ওষুদ কি দেব বল ?

ঠা। আগে মালিষের কথা বলি। বুকে পাঁজরে পুরান গাওয়া ঘি গরম করে বেশ করে মালিষ করবি।

লী। পুরান ঘি কোথায় পাব ?

ঠা। পুরান ঘি পাওয়া আজ কাল শক্ত, অনেক জায়গায় পুরান ঘি বলে যা বিক্রয় হয় সেটা ভেল। শুঁটের গুঁড়ো কি সাজি মাটির সঙ্গে নূতন ঘি মেড়ে পুরান বলে বিক্রি করে। আবার বড় বাজারে ঘি বিক্রির পর টিনগুলি তাতিয়ে ও তাথেকে একটু আধটু যা বেরোয় এক জায়গায় করে কোন কিছু মিশিয়ে কড়ো গন্ধ আর বদ রং করে পুরান ঘি বলে বেচে।

লী। ভাল পুরান কি করে চেনা যায় ঠাক্‌মা ?

ঠা। ভাল পুরান ঘির রং কটা হয়, খুব কড়ো গন্ধ হয় আর চাল ভাজার মত দানা বাঁধে। তা সেরকম ঘি বাজারেও পাবিনে আমাদের বাড়ীতে আছে একটু নিয়ে যাস্‌। সেই ঘি বেশ করে মালিষ করে, আকন্দ পাতা গরম করে বুকে সেক দিবি। আর সেক দেওয়া হয়ে গেলে গরম কাপড় দিয়ে বুকটা বেঁধে রাখবি।

লী। সেক কবার দেব ?

ঠা। সকালে সন্ধ্যায় দু'বার দিলেই হবে।

লী। এখন খাবার ওষুধের কথা বল।

ঠা। আমি অনেক গুলো ওষুদের কথা বলছি এর মধ্যে দু'টো ওষুদ দিবি। আর

কাসির ওষুদ একেবারে না খাইয়ে ২।১ ঘণ্টা অন্তর চেটে চেটে খেতে দিবি। (১) কণ্টকারী-ফুলের ভেতর যে কেশর থাকে তাই এক আনা মধুতে মেড়ে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (২) পিপুলের গুঁড়ো ½ রতি আর ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম দুই রতি মধুর সঙ্গে মেড়ে খাওয়ালে ভাল হয়, ময়ূর পুচ্ছ কিন্তু অন্তর্ধূমে ভস্ম করে নিতে হবে।

লী। অন্তর্ধূমে ভস্ম আবার কি?

ঠা। শোন্ বলি। ময়ূর পাখার চাঁদ গুলো কেটে নিয়ে একটা ছোট হাঁড়ির ভেতর রাখ্‌বি। তার পর সেই হাঁড়ির মুখে এক-খানা ছোট সরা কি কট্‌রা ঢাকা দিয়ে যোড়ের মুখ মাটী দিয়ে লেপে দিবি। লেপ শুকিয়ে গেলে সেই হাঁড়ি উনুনে চড়িয়ে তলায় জ্বাল দিলেই ভস্ম হয়ে যাবে।

লী। কতক্ষণ জ্বাল দিতে হবে?

ঠা। কড়া জ্বাল হলে ১৫।২০ মিনিটেই ভস্ম হয়ে যাবে।

লী। তার পর আর কি ওষুদ বল?

ঠা। (৩) কিসমিস দু'আনা, হরীতকী দু' আনা পিপুল তিন রতি বেশ চন্দনের মত করে বেটে ১টী ফোটা ঘি আর ২টী ফোটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (৪) কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল আর দুরালভা এই কয়েক মসলার মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (৫) ফট্‌-কিরির খৈ ১ রতি করে দু'বার খেলে সারে।

লী। হাঁ ঠাকুমা, শুনিছি বাসক কাসির খুব ভাল ওষুদ, তার কিছু দিলে হয় না?

ঠা। বাসক দিলে এ রকম কাস সারে না বরং বেড়ে যায়। পিত্ত ও কফ কাসেই বাসক ভাল কাজ করে।

লী। আর কি ওষুদ বল্‌বে বল?

ঠা। যা বলিছি ওতেই সেরে যাবে, তবে আরও একটা শিখে রাখ। একটা বেশ বড় অথচ পোকা লাগা নয় এমনতর বয়ড়া ঘি মাখিয়ে গোবরের ঠুলির ভেতর পুরবি, তার পরে সেটা ঘুটের আগুনে পোড়াবি, পোড়াতে পোড়াতে গোবর শুকিয়ে যখন জ্বলে উঠ্‌বে তখন আগুণ থেকে বের করে ভেঙ্গে সেই বয়ড়া নিবি। সেই বয়ড়ার বীচি ফেলে দিয়ে ৩।৪ রতি গুড়ো মধুর সঙ্গে খাওয়াবি।

লী। আচ্ছা, ছোট খোকারত হল. এখন বড় খোকার কি করবো বল?

ঠা। বড় খোকার অসুখের কথা সব বল।

লী। বড় খোকার আজ চার দিন হল অসুখ হয়েছে। দু'দিন কম ছিল কিন্তু পরশু থেকে সর্দ্দিতে একেবারে হাস্ ফাঁস্ করছে। মুখ খানা ভার ভার টুসো টুসো হয়েছে, মাথার যন্ত্রণা, খিদে বড় নেই, দাস্ত এক দিন হয় এক দিন হয় না, গাটাও ছ্যাক্ ছ্যাঁকে হয়েছে, আর নাক মুখ দিয়ে খুব সর্দ্দি পড়ছে।

ঠা। কাসি আছে?

লী। সে নেই বল্লেই হয়, এক আধ বার।

ঠা। নেই, এরপর হবে। গা বমি বমি করে?

লী। হাঁ, গা বমি বমি খুব করে।

ঠা। এই হল কফ কাসের প্রথম অবস্থা, এ অবস্থার প্রথমেই বমি করাতে হবে। মুক্ত-বর্ষীর (মুক্তাঝুরি, বেড়াল কাঁদুণী) পাতার রস চা চাম্‌চের এক চাম্‌চে আধ ছটাক জলের সঙ্গে খাইয়ে দিস্। তা হইলে বমি হবে। নয়ত যষ্টি মধুর কাথ করে সেই কাথের সঙ্গে পিপুল,

ইন্দ্রযব, সৈন্ধব লবণ ও বচ এই গুলির গুঁড়ো সমান ভাবে মিশিয়ে এক সিকি মাত্রায় ঐ কাথে মিশিয়ে খাইয়ে দিবি। তা হলেও বমি হয়ে অনেক শ্লেষ্মা উঠে যাবে।

নী। যষ্টিমধুর কাথ কি করে কর্‌বো আর কত টুকু দেব?

ঠা। এক ছটাক যষ্টিমধু ⁄২ সের জলে সিদ্ধ করে আধ সের থাক্‌তে নামিয়ে ছেঁকে নিবি। তারই দুই ছটাক আন্দাজ দিলেই হবে। কিন্তু রোগা দুর্ব্বল ছেলেকে বমি না করানই ভাল। আধ ছটাক ব্রাহ্মীশাক ও এক সিকি আদা থেঁতো করে কলার পাতে বেঁধে ঝল্‌সা পোড়া করে তার রস চা চামচের এক চাম্‌চে দেওয়া ভাল।

ঠা। সকালে বমি করাবি। তারপর কিছু খেতে দিস্‌নে। বেশ খিদে হলে বিকেলে খেতে দিবি।

নী। আচ্ছা ঠাকুমা, কফ কাসের সব অবস্থায় কি বমি করান চলে?

ঠা। না, যেখানে খুব সর্দ্দি উঠছে অথচ গা বমি বমি আছে সেইখানে বমি করান চলে। গা বমি বমি না থাকলে যদি বমি করান যায়, তা হলে রোগীর অনিষ্ট হয়।

নী। তারপর পথ্যি কি দেব বল?

ঠা। এক পোয়া ছাগলদুধ আর এক পোয়া জল সিদ্ধ করে, জল মরে গেলে সেই দুধে মিছরী আর ৩।৪ রতি মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিবি। কফ কাসে দুধ না দেওয়াই ভাল, কিন্তু ছেলে মানুষ আর অনেকখানি করে দুধ খাওয়া অভ্যাস, তা এই একবার করে দিবি এতে আহার ওষুধ দুই হবে।

নী। আর কি দেব?

ঠা। জলবার্লি, বার্লির রুটী, খৈ, এই সব দিবি।

নী। জল খাবার কি দেব?

ঠা। বেশী খিদেত নেই, জল খাবার আবার কি দিবি। খিদে হলে বেদানা, কিস্‌মিস্, কুমড়োর মেঠাই দিস্।

নী। বড় খোকা বড্ড মুড়ি ভালবাসে ঠাকুমা, দু'টি মুড়ি দিতে পারি?

ঠা। তা গরম গরম টাট্‌কা মুড়ি দু টি দিস্।

নী। এখন ওষুদ কি দেব বল?

ঠা। অন্য ওষুদের কথা বলবার আগে একটা কথা বলে রাখি, তোর দুই খোকাকেই গরম জল দিন ৩।৪ বার যত টুকু করে খাও-য়াতে পাবিস্ দিবি। জল একটু গরম হলেই গরম জল হয় না। অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট টগ্‌বগ্ করে ফোটা চাই। তার পর নামিয়ে সহ্য মত গরম খাওয়াবি। ঠাণ্ডাজল একে-বারেই দিবিনে। আর সমস্ত খাবারই গরম গরম দিবি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দিস্‌নে।

নী। গরম জল কি এত উপকারী?

ঠা। নবজ্বর, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, সর্দ্দি এসব রোগে গরম জল একটা মস্ত ওষুদ।

নী। আর কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। আদার রস চা চামচের এক চামচ ২০।২৫ ফোটা মধু মিশিয়ে সকালে বিকালে দু'বার করে দিস্ তা হইলে সেরে যাবে। ইচ্ছে হলে একবার আদার রস আর একবার শুঁঠ, পিপুল মরিচের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে তার দুই রতি গরম জলের সঙ্গে দিতে পারিস্। আর কিছু দেবার দরকার হবে না। তবে জামা কাপড় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রাখবি যেন বাতাস না লাগে। আর বুকটায় একটা গরম কাপড় বেঁধে রাখিস্।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, মাথার যন্ত্রণাটা যাতে শীঘ্র যায় এমন কোন উপায় নেই?

ঠা। এক কাজ করিস্, খাঁটি সর্ষের তেল গরম করে পায়ের তলায় খানিক ক্ষণ মালিষ করে দিস্ তা হলে মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, দু' রকমত শিখলাম, পিত্ত কাসের ওষুদও শিখিয়ে দাও না?

ঠা। বলি শোন। পিত্ত কাসে কফ পাতলা থাকলে এক সিকি তেউড়ীর গুঁড়ো চিনির সঙ্গে আর কফ ঘন থাকলে এক সিকি তেউড়ীর গুঁড়ো সমান চিরতার গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দাস্ত করাতে হয়। এবার যে মাত্রা বল্‌লাম এটা বড় লোকের মাত্রা। বয়স বুঝে মাত্রা কম কর্‌তে হয়।

লী। কি রকম বয়সে কত মাত্রায় দিতে হয়?

ঠা। ১২।১৩ বৎসর বয়েস হলে দু' আনা, ৫।৬ বছর বয়েস হলে এক আনা, ২।৩ বছর হলে আধ আনা এই মোটা মুটি বল্‌লাম।

লী। তার পর ওষুদ?

ঠা। গোটা কতক ওষুদ বল্‌ছি শোন। (১) কিস্‌মিস, আমলকী, খেজুর, পিপুল, মরিচ সমান ভাগে মিশিয়ে দু' তিন আনা মাত্রায়, গাওয়া ঘি এক আনা ও মধু দু' আনার সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (২) কিস্‌মিস, খেজুর, পিপুল, খৈ, চিনি সমান ভাগে মিশিয়ে তিন চার আনা মাত্রায়, গাওয়া ঘি ও মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (৩) পদ্ম-বীজের গুঁড়ো দু'তিন আনা মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (৪) বাসক পাতার রস ২ তোলা মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস, কফ কাস ও রক্তপিত্ত ভাল হয়। আর আগে যে বয়ড়া গোবরের ঠুলিতে পোড়ানোর কথা বলেছি, তাতেও পিত্তকাস ভাল হয় পথ্যির কথাত আগেই বলিছি।

লী। হাঁ, তা আগেও বলেছ। এখন আমার কাজ শেষ হল। ছোট বৌকে বকিছি—ছোট বৌ কি করছে একবার দেখিগে।

ঠা। বেশ কর্‌ছিস্ বকেছিস্, আমি তোর বিবেচনা দেখে বড় খুসী হয়েছি। এরকম একজন গিন্নি সংসারে থাকা দরকার। বউমা আমার খেটে খেটে গতর জল করে কিন্তু অত শত বোধ নেই।

লী। তবু আমি একবার দেখে যাই ঠাকুমা, ছেলে মানুষ অত বোঝে না মনে কষ্ট হতে পরে।

ঠা। চল আমিও একবার গোকুলকে দেখে আসি তার বুঝি কি অসুখ করেছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপকের পত্র।

আমি "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বহু বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রের নিকট বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি। অন্তরের প্রিয়বস্তু ভাবিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু চিন্তা ও করিয়াছি। আপনারা যে এত অনুষ্ঠান করিয়াছেন চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই, বা সোজা কথা বলিলে বিশ্বাস করি নাই বলাই ঠিক। অবিশ্বাস করায় বোধ হয় তেমন দোষও হয় নাই। কারণ ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা, অনেক সংবাদ প্রচার হইয়াছিল বটে কিন্তু ফলে ঐগুলি দম্পতিকলহে পরিণত হইয়াছিল। এবার যে এমন নিঃশব্দে কার্য্য হইতেছে কেমন করিয়া বুঝিব বলুন। আমার মত আর যাঁহারা শব্দমাত্রে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সংবাদ জানেন, বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মনের ভাবও হয়ত আমারই মত। এইজন্য দেশের অবস্থা চিন্তা করিয়া, আমি বিদ্যালয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি সঙ্গত মনে করেন জনসাধারণের বিদিতার্থ পত্রখানি মুদ্রিত করিবেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য —অনেকে মনে করিতে পারেন, এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের গৃহে গৃহে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার ব্যবস্থা রহিয়াছে তবে আবার এই বিদ্যালয় কেন? প্রথমেই বলিয়া রাখি বিদ্যালয়ের কর্ম্মিপুরুষগণ গুরুগৃহে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার বিরোধী নহেন কিন্তু আমরা বেশ বুঝিয়াছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে অধুনা দেশে যত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের প্রয়োজন গুরুগৃহে অধ্যাপনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকায় তত চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হওয়ায় রোগীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশে বিবিধ চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত থাকিলেও এখনও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাই বহুসংখ্যক প্রজাকে রক্ষা করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা দেশের লোকের অভিমত হইলেও পাঁচসাত খানি পল্লীর মধ্যে হয়ত একজনও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক নাই। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দেশের লোক আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের মধ্যে যাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যের প্রতিষ্ঠা আছে, যাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার যোগ্যতা আছে, তাঁহাদিগকে চিকিৎসা বৃত্তি লইয়া এতাদৃশ বিব্রত থাকিতে হয় যে, অধ্যাপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের অধ্যাপনার অবসর ঘটে না, অথবা কাড়িয়া জোর করিয়া তাঁহারা যতটুকু সময় অধ্যাপনার্থ ক্ষেপণ করিতে পারেন, তাহাতে অত্যল্পসংখ্যক ছাত্রেরও সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের বিহিত অধ্যাপনা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, নানাশাস্ত্রে কৃতশ্রম, বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ বিদ্যার্থী এই সকল আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপকের নিকট ইঙ্গিতমাত্র উপদেশ লাভ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও চেষ্টা বলে বৈদ্যকশাস্ত্রের কেবল শাস্ত্র-দৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন বটে কিন্তু উপকরণাভাব হেতু প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্ঞানলাভে প্রায়ই বঞ্চিত থাকিতে হয়। যাহা হউক সংস্কৃত চর্চ্চার অধুনা বিরল প্রচার হওয়ায়, এবম্বিধ বিদ্যার্থীর সংখ্যাও ক্রমশঃ অতি

অন্ন হইয়া পড়িতেছে। যে সকল অব্যুৎপন্ন ছাত্র, বড় গুরুর শিষ্য হইবার লোভে, এই সকল কর্ম্মাতিব্যস্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপকগণের আশ্রয় লইতেছে, তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করাইতে, অধম-বুদ্ধি শিষ্যের বোধোপযোগী করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য, যেরূপ দীর্ঘকাল ধীরতার সহিত পরিশ্রম ও উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক, গুরুর তাদৃশ সময়, সুবিধা ও স্পৃহা না থাকায়, তাহারা কেবল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের অভিনয় করিয়া, গুরু গৃহ হইতে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। এবং স্বীয় অনুপযুক্ততার জন্য জনসমাজে আয়ুর্ব্বেদের অগৌরব প্রচার করিতেছে মাত্র। অপরদিকে দেশের নিয়ম যে, কবিরাজ অন্নদান করিয়া ছাত্র পড়াইবেন। বিদ্যা থাকিলেই ধন থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই। যে সকল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম অতএব অধ্যাপনার যোগ্য, কিন্তু বিধিবশাৎ যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ, তাঁহাদের সময়, অবকাশ ও স্পৃহা থাকিলেও তাঁহারা ইচ্ছামত ছাত্র রাখিয়া দেশে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের অভাব দূর করিতে পারিতেছেন না। যে সকল কর্ম্মব্যস্ত চিকিৎসকের সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার অবকাশ নাই, তাঁহারা সুবিধামত কিঞ্চিৎমাত্র সময় ক্ষেপণ করিয়া এবং যাঁহাদের অবকাশ আছে তাঁহারা প্রচুর সময়ক্ষেপ করিয়া যদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে দেশে আর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব থাকে না। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এবম্বিধ সম্মেলন নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কলিকাতায় একটীমাত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের অভাব নিরাকৃত হইতে পারে না। দেশে এইরূপ শত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলে এবং প্রতি বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক শতজন ছাত্র সুচিকিৎসক হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিলে তবে আমাদের তৃপ্তি হইবে।

বিদ্যার্থি-গ্রহণের নিয়ম— সংপ্রতি দেশে যাহা নাই তাহার জন্য হা হুতাশ না করিয়া, দেশে যাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ করিয়া যাও এবং ভবিষ্যতে তোমার অভিপ্রেত উচ্চ আদর্শের জিনিষ যাহাতে প্রস্তুত করিতে পার তাহার জন্য আন্তরিক চেষ্টাকর। ইহাই প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মিপুরুষের পন্থা। যখন কলিকাতার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন যদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র না পাইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা দান করিবেন না এই সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা হইলে কি এ-দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার এতশীঘ্র এতাদৃশ প্রচার হইত? দেশের অবস্থানুসারে তখন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এখন তাঁহারা এত অভিমত, যোগ্য, ব্যুৎপন্ন ছাত্র পাইতেছেন যে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রহণ বিষয়েও আপনারা ঐরূপ কালোপযোগী উদার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমি আপনাদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতেছি। আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ-পাঠীর সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু যদি আপনারা নিয়ম করিতেন যে কেবল সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র ভিন্ন অপরের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার নাই, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিত। অতএব যত দিন দেশে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন বহুসংখ্যক ছাত্র না

পাওয়া যাইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া পড়িতে লিখিতে পারে এরূপ ছাত্র গ্রহণ করা হইবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা অতি উত্তম হইয়াছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সহস্র সহস্র সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতেছে দেখিতে পাইব। সংপ্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—বাঙ্গালা শ্রেণী ও সংস্কৃত শ্রেণী। সংস্কৃত পড়িতে বুঝিতে ও লিখিতে পারে এমন ছাত্রকে সংস্কৃত বিভাগে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইতেছে। সংস্কৃত বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগের ভাষা মাত্র ভিন্ন, শিক্ষাগত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিলাম না। বরং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া, বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণের সুশিক্ষার জন্য সুদক্ষ ও পরিপক্ব শিক্ষক অধ্যাপনায় মনোনীত করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র দেশান্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেবল প্রত্যক্ষ-দর্শনমূলক জ্ঞানার্জ্জন ও শল্য শালাক্য তন্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিষয় বিশেষ (যেমন দ্রব্যগুণ কি চিকিৎসা) অধ্যয়নের অভিলাষ থাকিলে তাহারও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হয় না। বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রকে মাসিক ৩ টাকা বেতন দিতে হয়। বিষয় বিশেষ অধ্যয়ন করিবার জন্য বেতনের যে বিশেষ নিয়ম আছে তাহা অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া জানিতে হয়। বাঙ্গালা বিভাগের পাঠ ৪ বৎসরে এবং সংস্কৃত বিভাগের পাঠ ৫ বৎসরে সমাপ্ত হয়। চরমপরীক্ষান্তে উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

অধ্যাপনার প্রণালী—আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপনা পূর্ব্বে এদেশে যেমন যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেইভাবে অথচ উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইতেছে। দ্রব্যগুণের অধ্যাপক অগ্রে দ্রব্যটী ছাত্রদিগকে দেখাইয়া চিনাইয়া দিয়া, বাজারে ঐ দ্রব্যের যত প্রকার নকল প্রচলিত সেগুলিও দেখাইয়া দিয়া, দেশ বিদেশে ঐ জিনিষটীর ভ্রমে যে সকল নকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে তাহার বিবরণ শুনাইয়া, দ্রব্যগুণ শিক্ষা দিতেছেন। মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাদান, সংস্থিতি ও সম্বন্ধ কঙ্কালে, প্রতিমূর্ত্তিতে ও চিত্রে দেখাইয়া, বুঝাইয়া, অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার অধ্যাপক অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। বিচিত্র বনস্পতি, ক্ষুপ, লতা, পুষ্প, সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া, দৃষ্টি-দীপক যন্ত্রের সাহায্যে সুযোগ্য অধ্যাপক বনৌষধি-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন। দোষধাতু-মলাদিতত্ত্বের অধ্যাপক বিবিধ সুরঞ্জিত চিত্র-সাহায্যে রক্ত-সম্বহনাদি ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রত্যক্ষবৎ বুঝাইতেছেন। রসোপরস ধাতুপধাতু প্রভৃতি বিবিধ স্থাবর খনিজ বস্তু সংগ্রহ করিয়া, রসশাস্ত্রের অধ্যাপক রসশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। দ্রব্যগুণ শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ে যে দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে তাহা দেখিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত কোন চিকিৎসক (ইনিও আমার মত একজন দর্শক) বলিলেন আমরা যদি পাঠ্যাবস্থায় এরূপ সুবিন্যস্ত ভেষজ পরিচয়াগার পাইতাম তাহা হইলে কত উপকার হইত। আমার সহপাঠী কোন প্রতিভাশালী প্রবীণ কবিরাজ শারীর পরিচয়াগারে সংগৃহীত নরকঙ্কাল,

আময়াদির মৃন্ময় মূর্ত্তি ও বিবিধ সুরঞ্জিত চিত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—"দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া আমার আবার শারীরের ছাত্র হইবার ইচ্ছা হয়।" অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ হইতে ছাগ-শশকাদির মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়া অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যার অধ্যাপনা হইবে জানিয়াছি। এস্থলে কেবল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনার প্রণালী যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই লিখিত হইল।

শ্রী • • •

বিবাহ-রজোদর্শন-গর্ভাধান।

আমরা এই প্রবন্ধে বিবাহ, রজোদর্শন-গর্ভাধান সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ ব্যাখ্যা করিব। সহজ ভাষায় সরলভাবে এই প্রবন্ধ লিখিত হইবে। লিখিত বিষয়ের প্রমাণার্থ বৈদ্যক শাস্ত্র হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ দুর্ব্বোধ করিব না।

বিবাহ—যে স্ত্রী বা পুরুষের এমন কোন রোগ আছে যে রোগ সঞ্চারী অর্থাৎ সন্তান সন্ততিতে সংক্রমিত হইতে পারে, তাঁহার বিবাহ করা উচিত নহে। স্ত্রী বা পুরুষ দীর্ঘ-রোগী হইলে কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রদরাদি যোনিরোগ থাকিলে বিবাহ নিষেধ। যে স্ত্রী বা পুরুষ এমন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে বংশে সঞ্চারী রোগ আছে, তাঁহাদের কালাপেক্ষা করিয়া, স্বস্ব স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ চিন্তা করিয়া বিবাহ করা বিধেয়। বিবাহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য নহে। আশ্রম ধর্ম্মের উত্তর সাধক, সমাজের হিতকারী, বলিষ্ঠ, কুলপাবন সন্ততি দ্বারা বংশরক্ষা করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। দীর্ঘ রোগপীড়িত স্ত্রীপুরুষ বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিলে সমাজে ক্ষীণ, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, অল্পায়ু লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া সমাজের অকল্যাণ সাধিত হইবে ভাবিয়া আয়ুর্ব্বেদ উহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সুরূপা, সুশীলা, সদ্বংশজাতা ও যে হীনাঙ্গী, বিকলাঙ্গী বা অধিকাঙ্গী নহে এরূপ পত্নী প্রশস্ত। যাঁহারা বিবাহ করিবার যোগ্য অর্থাৎ যাঁহাদের সুস্থ, বলিষ্ঠ সন্তানোৎপাদনের যোগ্যতা আছে তাঁহারা কত বয়সে বিবাহ করিবেন? সুশ্রুতের মতে পুরুষ ২৫ বৎসরে এবং নারী ১২ বৎসরে বিবাহ করিবেন। বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের মতে পুরুষ ২১ বৎসরে এবং নারী ১২ বৎসরে বিবাহ করিবেন।

রজোদর্শন—এদেশে ১২ বৎসরের পর বালিকাদের প্রথম রজোদর্শন হইয়া থাকে। ৫০ বৎসরে স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শন নিবৃত্তি পায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। অবস্থা বিশেষে আর্ত্তব-রক্তের আবির্ভাব তিরোভাব কালের ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। অসংযম, বিলাসিতা, কুগ্রন্থ পাঠ, অসৎসংসর্গ, রজোদর্শনের পূর্ব্বে পুরুষসহবাস ইত্যাদি কারণে উপরি লিখিত কালের পূর্ব্বেও রজোদর্শন হইতে পারে। এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ শোকাদি কারণে ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেও রজোনিবৃত্তি ঘটিতে পারে।

আর্ত্তব শোণিতের স্বভাব ও ভেদ—মাসে মাসে ঋতুকালে নারীদিগের গর্ভাশয়ে যে রক্ত সঞ্চিত হয় তাহার নাম আর্ত্তব শোণিত। এই আর্ত্তবশোণিত এবং শরীরের ধাতু-শোণিত

উভয়ই আহার জাত সৌম্যগুণান্বিত রস হইতে জন্মিয়া থাকে। একই রস হইতে উৎপন্ন হইলেও আর্ত্তব শোণিত আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিগুণ বহুল এবং ধাতু-শোণিত সৌম ও আগ্নেয়। এই আবর্ত্ত শোণিত দ্বিবিধ—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। যে আর্ত্তব শোণিত দেখিতে শশকের রক্ত বা লাক্ষা ("লা") সিদ্ধ করা জলের মত, যাহা কাপড়ে লাগিলে সহজেই ধুইয়া উঠান যায় তাহাই অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত। আর যাহা ঈষৎ কৃষ্ণ, বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত এবং ঋতু কালে ৩।৪ দিন যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায় তাহাই কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত। গর্ভোৎপাদন ও সুসন্তান লাভের পক্ষে ইহা প্রশস্ত নহে বলিয়া ইহার নাম কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত। অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত প্রশস্ত-গর্ভকৃৎ। ইহার স্রাব হয় না—শুক্র বীজের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভোৎপাদন করে। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত এক সময়ে সঞ্চিত হয় না। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত স্রাব হইয়া গেলে গর্ভাশয়ে অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত সঞ্চিত হয়। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত সকল ক্ষেত্রে ৩ দিনেই নিঃশেষরূপে স্রাব হয় না। ইহার স্রাব স্বাস্থ্য, ধাতু, মাতৃপ্রকৃতি অনুসারে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ইহা গর্ভাশয়ের পূর্ণ সুস্থতার পরিচায়ক নহে। কৃত্রিম আর্ত্তব নিঃশেষরূপে স্রাব না হইলে অকৃত্রিম আর্ত্তবের সঞ্চয় হয় না ইহাও নিশ্চিত।

ঋতু—দৃষ্টার্ত্তব ও অদৃষ্টার্ত্তব—ঋতু শব্দের অর্থ কাল, যেমন বর্ষা ঋতু শরৎ ঋতু। স্ত্রী-ঋতু শব্দের অর্থ স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ যোগ্য কাল। রজোদর্শন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত বহু-সম্মত-ঋতু অর্থাৎ গর্ভধারণ অনুকূল কাল। কাহারও মতে ঋতু ষোড়শ রাত্রি, মতান্তরে এক মাস। দৃষ্টার্ত্তব এবং অদৃষ্টার্ত্তব ভেদে ঋতু দুই প্রকার। যেখানে কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত যথারীতি স্রাব হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টার্ত্তব ঋতু এবং যেখানে কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিতের স্রাব দেখা যায় না তাহা অদৃষ্টার্ত্তব ঋতু বলিয়া কথিত। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত স্রাব না হইলেও ঋতু হইয়াছে অর্থাৎ গর্ভধারণ যোগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে ইহা কি প্রকারে জানা যাইবে? অদৃষ্টার্ত্তব ঋতু হইলে নারীশরীরে যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় আয়ুর্ব্বেদে সে গুলির উল্লেখ আছে, ঐ সকল লক্ষণ দ্বারাই অদৃষ্টার্ত্তব ঋতুর জ্ঞান হইবে। এই অদৃষ্টার্ত্তব ঋতুতে কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত অল্প থাকে বলিয়া স্রাব হয় না—ইহাতে কোন ক্ষতি নাই; কারণ অদৃষ্টার্ত্তব ঋতুতে, অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত, যাহা প্রশস্ত গর্ভোৎপাদনে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা যথোচিত পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। যে সময় অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত সঞ্চিত হয় (প্রায় ঋতুর চতুর্থ দিনের পূর্ব্বে হয় না) তাহাই যথার্থ ঋতু অর্থাৎ গর্ভাধান যোগ্য কাল।

গর্ভাধান—পূর্ব্বে বলিয়াছি ঋতু অর্থাৎ বহুসম্মত গর্ভধারণ যোগ্য কাল দ্বাদশরাত্রি। কিন্তু এই দ্বাদশ রাত্রিই গর্ভাধানের অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রীতে স্বামির উপগত হইবার প্রশস্ত কাল নহে; কারণ ঋতুর যে তিন দিন কৃত্রিম আর্ত্তব স্রাব হইতে থাকে সেই তিন দিন পরিবর্জ্জনের [illegible] আছে। পরিবর্জ্জনের হেতু এই—প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়দিনে কৃত্রিম আর্ত্তব স্রাব হইতে থাকে বলিয়া এই সময় বীজ প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভোৎপাদন করিতে

পারে না। যদি গর্ভোৎপত্তি হয় তাহা হইলে প্রথম দিনে গর্ভোৎপত্তি হইলে মৃত সন্তান প্রসব হয়, দ্বিতীয় দিনে সূতিকাগারেই মরিয়া যায় এবং তৃতীয় দিনে অসম্পূর্ণাঙ্গ ও অল্পায়ু হয়। চতুর্থ হইতে দ্বাদশ রাত্রির মধ্যে (কাহার মতে একাদশী রাত্রিও গর্ভাধানের পক্ষে নিন্দিত) সুতরাং অষ্টরাত্রি অবশিষ্ট রহিল। এই অষ্ট রাত্রির মধ্যে যদি পুত্রকামনা থাকে তাহা হইলে চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী রাত্রিতে অর্থাৎ রজোদর্শন দিন হইতে ৪।৬।৮ ১০।১২ দিনের দিন রাত্রিতে পত্নীতে উপগত হইবে। যদি কন্যাকামনা থাকে তাহা হইলে পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী রাত্রিতে অর্থাৎ ৫।৭।৯ দিনের দিন রাত্রিতে গর্ভাধান করিবে। পর পর রাত্রিতে গর্ভাধান করিলে সন্তানের আয়ু আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রিতে গর্ভাধানে সন্তানের আয়ু প্রভৃতি হ্রাস পায়। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত তিন দিনে নিঃশেষরূপে স্রাব হয় মোটামুটী ইহা ধরিয়া লইয়াই গর্ভাধানের উপরি লিখিত রূপ কালনির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ক্ষেত্রবিশেষে অধিক দিন পর্য্যন্তও উহার স্রাব হইতে দেখা যায়। কৃত্রিম আর্ত্তব শোণিতের স্রাব বন্ধ না হইলে আবার অকৃত্রিম আর্ত্তব গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হয় না। এই অকৃত্রিম আর্ত্তব সঞ্চয় না হইলে আবার প্রশস্ত গর্ভোৎপাদন সম্ভব নয়; সুতরাং দ্বাদশ রাত্রি অপেক্ষা গর্ভাধানের কাল বাড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই আচার্য্য উত্তর উত্তরকালে গর্ভাধানের প্রশস্ততা ও কেহ কেহ ১৬ দিন বা এক মাস পর্য্যন্ত ঋতু স্বীকার করিয়াছেন।

গর্ভাধানের বয়স—বিবাহ হইলেই স্ত্রীসহবাস বা স্ত্রীর রজোদর্শন হইলেই গর্ভোৎপাদন করা আয়ুর্ব্বেদের অভিমত নহে। আজকাল বিবাহের বয়স লইয়া অনেক বিচার বিতর্ক হইতেছে বটে কিন্তু গর্ভাধানের বয়সের কথা কয়জন ভাবিয়া থাকেন। এই সকল অপরিণামদর্শী সমাজ-হিত-চিন্তকের মতে বোধ হয় বিবাহ ও গর্ভাধানের কাল পৃথক্ রাখিবার প্রয়োজন নাই। অধুনা সমাজে এই পার্থক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায়, একদিকে অত্যন্ত বালার গর্ভাধান হওয়ায় সমাজে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অল্পায়ু সন্ততির সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে; অপর দিকে অধিক বয়স্কা স্বতন্ত্রমতি যুবতীর সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় গৃহস্থলীর চিরোপভুক্ত সুখশান্তি এবং সংসারের চিরাভ্যস্ত "ধরণ ধারণ" অন্তর্হিত হইতেছে। এই সকল অনর্থ পরম্পরা চিন্তা করিয়া এদেশে পূর্ব্বে বিবাহ ও গর্ভাধানের কাল পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ পুরুষের বিবাহের বয়স ২৫ বা ২১ বৎসর এবং নারীর ১২ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারীর ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধে রজোদর্শন হইয়া থাকে ইহাও কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন গর্ভাধানের সময় পুরুষের বয়স ২৫ বা ২৯ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স ১৬ বৎসর হওয়া উচিত। দম্পতির বয়স ইহার কম হইলে সন্ততি গর্ভেই মরিয়া যায়। যদি গর্ভে না মরে তাহা হইলে অল্পায়ু হইবে। যদি অল্পায়ু না হয় তাহা হইলে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া (অর্থাৎ অল্প বয়সে চক্ষুর দোষ, কর্ণের দোষাদি জন্মিয়া) কোন রূপে বাঁচিয়া থাকিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদের মতে বিবাহের তিন বৎসর পরে গর্ভাধানের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে রজোদর্শনের কাল স্পষ্ট লিখিত নাই—কেবল দ্বাদশ বর্ষের ঊর্দ্ধে বলা

হইয়াছে মাত্র, সুতরাং যদি রজোদর্শন ১৩ বৎসরে গণনা করা যায়, তাহা হইলে রজোদর্শনের ২ বৎসর পরে গর্ভাধানের কাল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহা নিতান্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। শিশুর দন্তোদ্‌গম হইলেই যেমন তাহার কঠিন খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া খাইবার শক্তি জন্মে না এবং চর্ব্ব্য খাদ্য যেমন তাহাকে খাইতে দেওয়াও হয় না, তদ্রূপ নারীগণের রজোদর্শন হইলেই তাহাদিগকে গর্ভাধানের যোগ্য বিবেচনা করা কোন মতেই সঙ্গত নহে—কাল অপেক্ষা করিতে হয়। বিবাহের পরবর্ত্তী তিনটী বৎসর নারীগণ ভর্ত্তৃগৃহে বা পিতৃগৃহে থাকিয়া গৃহস্থলীর উপযোগী বিবিধ জ্ঞান লাভ করিবে এবং যেসকল গুণ থাকিলে রমণীগণ গৃহলক্ষ্মী হইতে পারেন কন্যার অভিভাবকগণ যত্ন পূর্ব্বক তদ্রূপ শিক্ষা দিবেন। পৃথক্ বাস করিলেও নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়জনের সহিত আমরা যেরূপ দেখাশুনা যাওয়া আসা করিয়া থাকি, বধূ তিনটী বৎসর স্বামী ও শ্বশুর কুলের গুরুজনের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। স্বামী এবং অন্যান্য গুরুজনের প্রকৃতি এবং অভ্যাস বুঝিয়া তদনুকূলে স্বীয় চরিত্র, আচার ব্যবহার গঠন করিবেন। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন এবং যাঁহাদের পুত্রেরা ২২ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারেন তাঁহদের পক্ষে তিন বৎসর কাল কন্যা বা বধূ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে; কিন্তু আজকাল কন্যার বিবাহে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু প্রচুর অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায়, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া অনেকের পক্ষেই দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। যদি ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষে বিবাহ হয়, আর পূর্ব্বের সেই প্রথা—"বিবাহের পর বছর না ফিরিলে শ্বশুর বাড়ী যাইতে নাই" দৃঢ়ভাবে বলবৎ রাখিয়া, "ধূলাপায়ে দিনের" কুত্রাপি প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, তাহা হইলেই অতি সহজে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রশস্ত গর্ভাধানের কাল সর্ব্বথা অনুবর্ত্তিত হইতে পারে। আজকাল "ধূলাপায়ে দিন করার" প্রবল প্রচারের দিনে এসকল কথা লোকের কত রুচিকর হইবে জানিনা, কিন্তু যদি বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু সন্ততি আমাদের প্রার্থয়িতব্য হয়, যদি এদেশের সেই চির-মধুর গৃহস্থলীর সুখশান্তি আবার ফিরিয়া পাইতে চাও, যদি সমাজকে সুপটু শিল্পী, রসজ্ঞ কবি, যথার্থ ধার্ম্মিক ও দেশহিতব্রত মহাপ্রাণ মানুষে অলঙ্কৃত দেখিতে চাও, তাহা হইলে বিবাহ ও গর্ভাধানের বয়সের পার্থক্য অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। দম্পতির প্রতি বক্তব্য এই—তোমরা সন্ততির মঙ্গলের অনুরোধে, সমাজের হিতের অনুরোধে, সকলের বড় ধর্ম্মের অনুরোধে, মনুষ্যত্বের অনুরোধে সামান্য ২।১ বৎসর সংযম অবলম্বন করিয়া, জাতীয় সমুন্নতির মূল এই মহাব্রত পালন করিবে। যদি না করিতে পার, যদি অসংযমে আত্মবিসর্জ্জন দাও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে অন্নের জন্য বহু বিনষ্ট করিতে উদ্যত বিচারমূঢ় বলিব।

ঋতুকৃত্য—বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু, সুসন্তান লাভ করিবার জন্য ঋতুকালে স্ত্রীকে যে সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই নাম ঋতুকৃত্য। আমরা ঋতুকৃত্যকে বিহারাচারগত ও আহারগত এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিব। প্রথমে বিহারাচারগত ঋতুকৃত্য লিখিত হইতেছে। ঋতুর প্রথম তিন দিন স্ত্রী ব্রহ্মচারিণীর মত থাকিবেন। এই সময়ে স্ত্রীর দিবানিদ্রায় পুত্র নিদ্রালু, অঞ্জনে অন্ধ, রোদনে

বিকৃত-দৃষ্টি, স্নান ও অনুলেপনে দুঃখশীল, তৈলমর্দ্দনে কুষ্ঠী, নখ কর্ত্তনে কুনখী, দৌড়িলে চঞ্চল, অধিক হাসিলে প্রলাপী, অধিক কথা কহিলে বা উচ্চ শব্দ করিলে বধির হয় সুতরাং রজঃস্বলা নারী এই সমস্ত বর্জ্জন এবং কুশাসনে শয়ন করিবেন্। রজঃস্বলার আহার—বিশুদ্ধ গব্যঘৃত মিশ্রিত সূক্ষ্ম পুরাণ তণ্ডুলের অন্ন বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ যোগে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিবেন। এ অবস্থায় স্বামিদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

গর্ভাধান কৃত্য—গর্ভোৎপাদন কালে স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপরি সন্তানের শারীরিক ও মানসিক ভাব সম্পূর্ণ নির্ভর করে; অতএব সন্ততির মঙ্গল কামনায় দম্পতিকে কেবল রিপুপরতন্ত্র হইয়া গর্ভাধান করিতে আয়ুর্ব্বেদ নিষেধ করিয়াছেন, এবং সুসন্ততি লাভ করিবার জন্য যে সকল নিয়ম পালন করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেই গুলিকেই আমরা গর্ভাধান কৃত্য নামে অভিহিত করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি পুরাণ রজঃস্রাব বন্ধ না হইলে গর্ভাধানের প্রশস্ত কাল উপস্থিত হয় নাই জানিবে। সাধারণতঃ তৃতীয় দিনেই রজঃস্রাব বন্ধ হয় ধরিয়া লইলে চতুর্থ দিবস হইতেই গর্ভাধানের কাল বলা যাইতে পারে। চতুর্থ দিনে স্ত্রী স্নান করিয়া উত্তম বস্ত্রও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক মঙ্গলানুষ্ঠান ও স্বস্তিবাচন করিয়া স্বামীকে দর্শন করিবেন, কারণ ঋতুস্নাতা নারী প্রথমে যেরূপ মনুষ্য দর্শন করেন তদ্রূপ পুত্র প্রসব করেন। গর্ভাধান কালে স্ত্রী অতিভুক্তা ক্ষুধিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনা, শোকার্ত্তা ক্রুদ্ধা, অন্য পুরুষকামা কিম্বা অতি মৈথুনাভিলাষিণী হইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না—হইলেও সুসন্তান জন্মে না। মনোজ্ঞ হিতকর বস্তু ভোজন করিয়া, গর্ভাধান কালে দম্পতি শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবেন, সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ধারণ করিবেন এবং প্রফুল্ল ও উদার ভাবে সুগন্ধি সুখকর শয্যায় শয়ন করিবেন। শুক্র, আর্ত্তব ও গর্ভাশয় সম্যক্ বিশুদ্ধ থাকিলে গর্ভাধান নিশ্চয় সফল হইয়া থাকে এবং বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু সুসন্ততি লাভ হয়।

যদি বিশিষ্ট অপত্যলাভের অভিলাষ থাকে তাহা হইলে দম্পতি একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। মৈথুনাদির চিন্তা ও করিবেন না। রজোদর্শন হইতে চতুর্থ দিবসে "পুত্রীয় বিধান" (যজ্ঞ বিশেষ) যোগ্য উপাধ্যায় দ্বারা নির্ব্বাহ করাইবেন। রজোদর্শন দিবস হইতে যত বিলম্ব করিয়া পারেন গর্ভাধারণের রাত্রি নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐ দিন অপরাহ্নে পুরুষ, দুগ্ধ ও গব্যঘৃত সহ শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবেন। স্ত্রী, যাহা ভোজন করিবেন তন্মধ্যে তিলতৈল এবং মাষ কলায় প্রধানভাবে থাকিবে। ইহাই সুশ্রুতের মত। চরকের মত এই—স্ত্রী যদি উন্নত কায়, গৌরবর্ণ, সিংহতুল্য তেজস্বী, শুচি ও সত্ত্ববান্ পুত্র ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চতুর্থ দিবসে শুদ্ধস্নানের পর পুরাণ যবের মিহি ছাতু মধু ও গব্যঘৃত মিশাইয়া শ্বেতবৎসা শ্বেতবর্ণ গাভির দুগ্ধে তরল করিয়া কাংস্য বা রজত পাত্রে সময়ে সময়ে সপ্তাহ পর্য্যন্ত পান করিবেন। প্রাতে প্রতিদিন একবার মাত্র শালিতণ্ডুলের অন্ন কিম্বা যবের অন্ন, দধি, মধু, ঘৃত যোগে কিম্বা গব্যদুগ্ধ যোগে ভোজন করিবেন। পরিষ্কৃত গৃহে পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিবেন। উত্তম আসন, উত্তম যান, উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ ও উত্তম বেশ ধারণ করিবেন প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃহৎ শ্বেতবর্ণ বৃষ ও পীতচন্দন-চর্চ্চিত শ্রেষ্ঠ

জাতীয় অশ্ব দর্শন করিবেন। স্ত্রীকে মনোনুকূল মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট রাখিবে। যে স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতি সৌম্য, বচন সৌম্য, আচার সৌম্য এবং কর্ম্ম সৌম্য তাহাদিগকে এবং যে রূপ দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় যে শব্দ শ্রবণে কর্ণ সুখী হয় এমন দৃশ্য দর্শন ও শব্দ শ্রবণ করাইবে। সেবানুকূল অনুরক্ত সহচরীগণ সেবা করিবে। কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হইবে না। রজোদর্শনের চতুর্থ রাত্রি হইতে সপ্ত রাত্রি পর্য্যন্ত উপরি লিখিত নিয়ম পালন করিয়া পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বামীর সহিত অগ্নিকে পশ্চিম দিকেও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া উপবেশন পূর্ব্বক পুত্রকামনা করিবেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকাম্য যজ্ঞ করিবেন, যজ্ঞান্তে হোমের অবশিষ্ট ঘৃত প্রথমে স্বামী পরে স্ত্রী পান করিবেন। অনন্তর অষ্ট রাত্রি পূর্ব্বকথিত পরিচ্ছদাদি ধারণ পূর্ব্বক স্ত্রীসহবাস করিলে অভিলষিত পুত্র লাভ হয়।

সন্ততির বর্ণ যেরূপ ইচ্ছা করিবেন দম্পতির পরিধেয় এবং বৃষের বর্ণ ও তদ্রূপ হওয়া উচিত। অতঃপর সংক্ষেপতঃ উপদেশ এই যে,—স্ত্রী যেরূপ সন্ততি ইচ্ছা করিবেন, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবেন, সেই সেই জনপদের আহার ও পরিচ্ছদ চিন্তা করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical ?

প্রবন্ধের নামে ইংরাজি শব্দের ব্যবহার দেখিয়া পাঠক মহাশয় রাগ করিবেন না। যাঁহাদিগের জন্য বিশেষতঃ এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে তাঁহারা ঐ ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করেন এবং ঐ শব্দের বঙ্গানুবাদ অপেক্ষা মূল ইংরাজি শব্দটাই তাঁহাদিগের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমরাও বাধ্য হইয়া ইংরাজি শব্দই ব্যবহার করিলাম। আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical বলিলে এই বুঝা যায় যে,—আয়ুর্ব্বেদে রোগ কি? কেন হয়? কিরূপে হয়? কিরূপেই চিনিতে পারা যায়? ইত্যাদি রোগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নাই। দ্রব্যের গুণ কি? শরীরের উপরি দ্রব্যের ক্রিয়া কি? দ্রব্য কিরূপেই রোগ প্রশমিত করে? ইত্যাদি চিকিৎসা বিষয়ক তত্ত্ব ও আয়ুর্ব্বেদে নাই। অর্থাৎ যাহারা আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করে তাহারা রোগও চিনে না ঔষধের গুণও জানে না। কেবল মূঢ়ের মত এইটুকু জানে যে এই ঔষধে এই রোগ ভাল হয়। দীর্ঘকাল এইরূপ না জানিয়া শুনিয়া বুক ঠুকিয়া ঔষধ দিতে দিতে যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি রোগ আরাম করিয়া রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে কোন কোন লোকের বা কোন কোন সম্প্রদায়ের এই রূপ ধারণা শুনিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন না। এমনই যুগধর্ম্ম যে, অধুনা অজ্ঞ বা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই সুশিক্ষিত বলিয়া যাঁহাদিগের খ্যাতি আছে তাঁহাদের অনেকের ও অভ্যাস এই যে, যে কোন বিষয়ে রায় প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কিছু মাত্র কুণ্ঠতা নাই। যে বিষয়ে তাঁহারা কিছু মাত্র অধিকার নাই যে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই সে বিষয়েও পরের মুখে ঝাল খাইয়া তাঁহারা নিজ মত প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র

দ্বিধা বোধ করেন না। এখন আর অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই—সকলেই মনে করেন আমার সকল বিষয়েই অধিকার আছে। সাধারণ লোকও তেমনি—কে বলিতেছে, যিনি বলিতেছেন তাঁহার এ বিষয়ের জ্ঞান কিরূপ, তাঁহার কথা বিশ্বাস যোগ্য কিনা, বিবেচনা না করিয়া,শ্রুত কথার তাৎপর্য্য সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া "গন্ধর্ব্বসেন মরগয়া" শুনিয়াই কাঁদিয়া আকুল। গন্ধর্ব্বসেন যে ধোবার গাধা—মানুষ নহে, ইহাও ক্রন্দনকারীদের জানা নাই। শ্রোতাদিগের ত এই অবস্থা। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ Empirical বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় মহাশয় আপনি কি আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াছেন ? তাহা হইলে নিশ্চয় শুনিতে পাইবেন যে তিনি স্বয়ং মূলগ্রন্থ পড়েন নাই কিন্তু কোন ইংরাজি পুস্তকে ইংরাজের লেখা আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক কোন প্রবন্ধ পড়িয়া বা কোন একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি করিয়া কিম্বা কোন কবিরাজের সহিত আলাপ করিয়াই নিজে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদ Empirical. উপরি লিখিত প্রবন্ধ লেখক ইংরাজ, আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ কিম্বা কবিরাজ বিশেষের সহিত আলাপ, যদি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা কি আয়ুর্ব্বেদের দোষ ? পেচক যে দিনে দেখিতে পায় না তার জন্য কি সূর্য্য দায়ী ? বসন্তকালে বৃক্ষ বিশেষের পত্র না থাকিলে সেটা কি বসন্তকালের দোষ ? একথাটা তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। যে সমাজে শিক্ষিতাভিমানিগণেরও এই অবস্থা সে সমাজের যে নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। যে চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্ব্বেদ এতদিন তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে একটা অপবাদ রটাইবার পূর্ব্বে—একবার সেই শাস্ত্রটা নিজে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ছিল না কি ? দেখিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত নিজেদের বুদ্ধিমান্ বলিয়া আত্ম প্রকাশের দাবিটাও বজায় থাকিত। আয়ুর্ব্বেদ পরীক্ষা করিয়া দেখাও যে সোজা ব্যাপার নয় ; আয়ুর্ব্বেদ যে ভাষায় কথা বলেন অনেকের সেই ভাষাই জানা নাই ; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও শিক্ষাদোষে তাঁহারা পরীক্ষা করিতে পারিছেন না। না পারিয়া নির্ব্বাক্ থাকাই উচিত ছিল। না বুঝিয়া অপবাদ রটনা করিলে আয়ুর্ব্বেদের কোনই ক্ষতি নাই। মণি যদি কর্দ্দমে পতিত থাকে তাহাতে মণির লজ্জা কি ? সুগন্ধি পুষ্প যদি বনে ফুটিয়া বনেই মলিন হয় তাহাতে পুষ্পের ক্ষতি কি ? তবে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ লইয়া ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের মনোবেদনা জন্মিতে পারে। যাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদের স্বরূপ বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ শক্তি নাই, তাঁহাদিগের জন্যই আমরা এই শ্রমস্বীকার করিয়াছি। যাঁহারা চিরদিনই "পর-প্রত্যয়নেয় বুদ্ধি" বা যাঁহারা পরের জিনিষকে মন্দ ভাবে দেখিতেই চিরাভ্যস্ত তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নিবেদন করিয়াছি আমাদের এই শ্রমস্বীকার তাঁহাদের জন্য নহে। সর্ব্বাগ্রে একটা কথা বলিয়া রাখি। পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক হইলেও উহাদের প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেই সেই চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝিতে হইবে। আমি যে চিকিৎসা শাস্ত্রে জানি, জগতের যাবতীয়

চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রস্থান যে ঠিক তাহার মতই হইবে এরূপ আশা করা বাতুলতা, কিম্বা চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষকে তুলাদণ্ড করিয়া অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের লঘুত্ব প্রমাণ করিতে যাওয়াও বিষম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। আমিই অখণ্ড সত্য আয়ত্ত করিয়াছি আর কাহারও নিকট সত্য প্রকাশ পাইতে পারে না এইরূপ সিদ্ধান্ত, মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। আয়ুর্ব্বেদ বুঝিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদের প্রস্থান, আয়ুর্ব্বেদের প্রাণালী অনুসরণ করিয়া বুঝিতে হইবে। নিজের নিজের মাপকাটী দিয়া মাপিলে সত্য নির্ণয় হইবে না।

রোগতত্ত্ব বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ কি বলিয়াছেন অগ্রে তাহাই বলিব। রোগতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই কএকটী বিষয় জানিতে হয়—(১) রোগ কি? (২) রোগ কত প্রকার? (৩) রোগের কারণ কি ও কত প্রকার? (৪) কিরূপে রোগজন্মে অর্থাৎ রোগের সম্প্রাপ্তি কি? (৫) রোগ চিনিবার উপায় অর্থাৎ রোগের পরীক্ষা ও লক্ষণ (৬) রোগের উপসর্গ (৭) রোগের অসাধ্য লক্ষণ। এক্ষণে আমরা রোগতত্ত্বকে উপরি লিখিত ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মত ব্যখ্যা করিব।

রোগ কি? - চরক বলিয়াছেন 'বিকারো ধাতুবৈষম্যম্ সাম্যম্ প্রকৃতি রুচ্যতে"—ধাতুর সমতা স্বাস্থ্য, ধাতুর বিষমতা রোগ। ধাতু কি? যাহারা শরীর-রক্ষণোচিত কর্ম্ম করিয়া শরীর ধারণ করে তাহারা ধাতু। উহারা কে? বায়ু, পিত্ত ও কফ। এই বায়ু পিত্ত, কফের কার্য্য অনুসারে দুইটী নাম আছে—ধাতু ও দোষ। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া অর্থাৎ নিজ পরিমাণে নিজ স্থানে এবং নিজ প্রকৃতিতে থাকিয়া শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিলে অর্থাৎ সমভাবে থাকিলে ইহাদিগকে ধাতু বলে। এই ধাতু সাম্যই স্বাস্থ্য। আর ইহারা স্ব স্ব পরিমাণে বৃদ্ধি বা ক্ষয় প্রাপ্তি হইলে, নিজের স্থান হইতে বিচ্যুত হইলে এবং নিজ নিজ প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে ইহারা দোষ নামে অভিহিত হয়, ইহাই ধাতু বৈষম্য বা রোগ। স্বাস্থ্য প্রকৃতি হইলে রোগ বিকৃতি, রোগ স্বাস্থ্যের বিকৃত অবস্থা সুতরাং রোগ বুঝিতে গেলে স্বাস্থ্য কি বুঝিতে হয়। এই ধাতু বৈষম্য-রূপ রোগের লক্ষণটী অতি সূক্ষ্ম। এই হিসারে বিচার করিতে গেলে সুস্থ লোক প্রায় পাওয়া যায় না। ধাতু-বৈষম্য এই নাম ভিন্ন, রোগ বলিয়া এই অবস্থার শাস্ত্রে আর কোন নাম নাই। এই আদ্য ধাতুবৈষম্য অতি অল্প বলিয়া ইহার কোন চিকিৎসাও নাই। এই অবস্থাকে ব্যবহারিক রোগ বলিয়া গণনা করা হয় নাই, উপেক্ষা করা হইয়াছে। কেবল চরকে নহে সুশ্রুতে ও রোগের এই সূক্ষ্ম অবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাই। সুশ্রুত বলিয়াছেন "তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে" (সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়) ইহার স্থূল অর্থ এই—পুরুষে (প্রাণীর) দুঃখ-সংযোগই রোগ। আরোগ্য সুখ—রোগ দুঃখ। আমরা উপরে যে ধাতু বৈষম্যের কথা বলিয়াছি, যখনই সেই ধাতু-বৈষম্য জন্মে তখন অবশ্যই দুঃখোৎপাদন হইয়া থাকে, এই দুঃখোৎপত্তিই রোগ। আদ্য ধাতু বৈষম্যের যেমন রোগ বলিয়া বিশেষ কোন নাম নাই—এই দুঃখ-সংজ্ঞক রোগেরও শাস্ত্রে তদ্রূপ কোন নাম নাই। রোগের সূক্ষ্ম অবস্থার কথা বলা হইল এক্ষণ শাস্ত্রে ব্যবহারতঃ যাহাকে রোগ বলা হইয়াছে—যেমন জ্বর, অতিসার প্রভৃতি তাহার লক্ষণ বলিতেছি। এই ব্যবহারিক

জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগের অনেক প্রকার ভেদ আছে এবং এই সকল রোগ-ভেদের লক্ষণ রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে (নিদানে) বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। আমরা এস্থলে কেবল ব্যাধিজাতির দুই একটি লক্ষণ বলিতেছি ; জ্বরজাতীয় রোগের লক্ষণ,—শরীরের এবং মনের সন্তাপ — যে কোন জ্বরই হউক না কেন উহা সন্তাপ-লক্ষণ হইবেই, এইরূপ মলদ্বার দ্বারা দ্রব বস্তু নিঃসরণ, অতিসার জাতীয় রোগের লক্ষণ, সমস্ত অতিসারেই এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে। প্রকুপিত বাতাদি যাবতীয় রোগের জনক।

(২) রোগ কত প্রকার ?—দুঃখসংযোগই ব্যাধি একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক দুঃখ কি ? এখানে আত্মা শব্দে শরীর এবং দুঃখ শব্দে দুঃখের (রোগের) কারণ কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ অর্থাৎ দোষকৃত শারীর দুঃখ—জ্বরাদি এবং মানস দুঃখ কামাদি বিকারই আধ্যাত্মিক দুঃখ। আধিভৌতিক দুঃখ কি ? এখানে ভূত শব্দে বাহ্য বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি, ইহাদের দ্বারা যে দুঃখ জন্মে তাহাই আধিভৌতিক এবং দেবাসুর কর্ত্তৃক যে দুঃখ জন্মে তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ সাত প্রকার ব্যাধিরূপে প্রাণিদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকে। সাত প্রকার ব্যাধি এই—(১) আদিবল-প্রবৃত্ত (২) জন্মবল-প্রবৃত্ত (৩) দোষবল-প্রবৃত্ত (৪) সঙ্ঘাতবল-প্রবৃত্ত (৫) কালবল-প্রবৃত্ত (৬) দৈববল-প্রবৃত্ত (৭) স্বভাববল-প্রবৃত্ত। আদিবল-প্রবৃত্ত রোগ কাহাকে বলে ?—পিতার দূষিত শুক্র এবং মাতার দুষ্ট আর্ত্তবশোণিত জন্য সন্তানের যে কুষ্ঠ, অর্শ, মধুমেহ ও ক্ষয়াদি রোগ জন্মে সেইগুলি আদিবল-প্রবৃত্ত রোগ। আদিবল-প্রবৃত্ত রোগ দুই প্রকার—মাতৃজ ও পিতৃজ। যে রোগ কেবল দূষিত আর্ত্তবশোণিত জন্য তাহা মাতৃজ এবং যাহা কেবল দুষ্ট শুক্র হইতে জন্মে তাহা পিতৃজ বলিয়া জানিবে। (২) জন্মবল-প্রবৃত্ত রোগ কি ?—গর্ভাবস্থায় চতুর্থ মাস হইতে গর্ভবতী নারীর কোন বিশেষ বস্তু ভক্ষণে, কোন বিহারে বা কোন দ্রব্যাদি দর্শনে যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহার নাম দৌহৃদ অর্থাৎ সাধ ; গর্ভিণীর এই সাধ পূরণ করা উচিত। না করিলে দৌহৃদের অবমাননা হেতু গর্ভস্থিত শিশু বোবা, খোঁড়া বা বামন হইতে পারে। এইগুলি জন্মবল-প্রবৃত্ত রোগ। আরপর গর্ভাবস্থায় প্রসূতির যেরূপ আহার আচার পালন করিবার বিধি শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, প্রসূতি যদি সেইগুলি পালন না করে তাহা হইলে গর্ভস্থিত শিশুর যে অপরাপর রোগ জন্মিয়া থাকে সেগুলিও জন্মবলপ্রবৃত্ত ব্যাধির অন্তর্গত জানিবে। (৩) দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি কি ?—জন্ম প্রভৃতি ভূত দোষজাত জ্বরাদি এবং রোগ হইতে জাত রোগকে (যেমন জ্বরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে কাস ইত্যাদি) দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি বলে। ইহা দুই প্রকার—আমাশয়-সমুত্থ ও পক্বাশয়-সমুত্থ। কুপিত কফপিত্ত হইতে যে সকল রোগ নাভির উপরিভাগে জন্মিয়া থাকে তাহাদের নাম আমাশয়-সমুত্থ এবং কুপিত বায়ু জন্য যে সকল রোগ নাভির অধোভাগে জন্মিয়া থাকে তাহাদিগকে পক্বাশয়-সমুত্থ রোগ বলে। দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি আবার শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ ; কুপিত বায়ু পিত্ত কফ যে সকল রোগের কারণ এবং যেগুলি শরীর আশ্রয় করিয়া

জন্মে সেইগুলি শারীর রোগ এবং যেগুলি রজঃ ও তমঃ হইতে জন্মে এবং যে সকল রোগ প্রথমে মন আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় সেগুলি মানস রোগ। আদিবল, জন্মবল ও দোষবল-প্রবৃত্ত এই তিন প্রকার ব্যাধি আধ্যাত্মিকব্যাধি নামে জ্ঞাত। (৪) সঙ্ঘাতবলপ্রবৃত্ত রোগ কি ?—দুর্ব্বল ব্যক্তি বলশালী লোকের সহিত লড়িলে বা পাল্লা দিয়া কোন কাজ করিলে, পর্ব্বত, বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইলে যে সকল আগন্তু রোগ জন্মিয়া থাকে সেই সকল ব্যাধিকে সঙ্ঘাত-বলপ্রবৃত্ত রোগ বলে। ইহা দুই প্রকার—শস্ত্র-কৃত ও ব্যাল অর্থাৎ হিংস্রজন্তু কৃত। সঙ্ঘাত-বলপ্রবৃত্ত রোগের অপর নাম আধিভৌতিক দুঃখ। (৫) কালবলপ্রবৃত্ত রোগ কি ?—শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষাদি হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগকে কালবলপ্রবৃত্ত রোগ বলে। এই কালবলপ্রবৃত্ত রোগ দুই প্রকার—ব্যাপন্ন ঋতু কৃত ও অব্যাপন্ন ঋতুকৃত। যে ঋতুতে বায়ু, জল, ভূমি প্রভৃতির যেরূপভাব হওয়া উচিত তাহা না হইলে সেই ঋতুকে ব্যাপন্ন ঋতু বলে—যেমন বর্ষাকালে যদি উপযুক্ত বর্ষণ না হয় গ্রীষ্মকালে যদি শীত হয়, তাহা হইলে ব্যাপন্ন ঋতু বলিতে হইবে। এই ব্যাপন্ন ঋতু যে বিবিধ রোগ জন্মায় সেইগুলিকে ব্যাপন্ন ঋতু-কৃত কালবলপ্রবৃত্ত রোগ, আর যদি ঋতু ব্যাপন্ন না হয় তাহা হইলে কেবল কালধর্ম্মেও ঋতু বিশেষে এক একটী দোষ (বায়ু বা পিত্ত কিম্বা কফ) কুপিত হইয়া থাকে। মানুষ বেশ নিয়ম পালন করিয়া থাকিলেও কাল-ধর্ম্মেই বায়ু, পিত্ত বা কফের সঞ্চয় ও প্রকোপ হইয়া রোগ জন্মাইতে পারে, ইহাই অব্যাপন্ন ঋতুকৃত কালবলপ্রবৃত্ত রোগ। এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষায় কেবল কালধর্ম্মে কিরূপে রোগ জন্মে এবং তাহার প্রতীকার কি ? আয়ুর্ব্বেদে অতি বিশদভাবে এই তত্ত্ব আলো-চিত হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে কেবল বিষয়টী মোটামুটি বুঝাইবার জন্য কিছু লিখি-তেছি। জিজ্ঞাসু পাঠক মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে পুরস্কৃত ভিন্ন বঞ্চিত হইবেন না। এক ঋতুতে কিরূপে দোষের সঞ্চয় হয় এবং পরবর্ত্তী ঋতুতে কিরূপেই বা উহার প্রকোপ হইয়া ব্যাধি জন্মায় তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি—বর্ষাকালে দ্রব্যগুলি তরুণ এবং অল্প বীর্য্যসম্পন্ন হয়, জল ঘোলা এবং বিবিধ মলিন বস্তু সংযুক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন ও ভূমি আর্দ্র এবং কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া থাকে। ঐরূপ দ্রব্য আহার করিয়া, ঐরূপ ভূমিতে বাস করিয়া মানব শরীরও ক্লিন্ন ভাবাপন্ন হয়। বর্ষাকালীন শৈত্যে বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নি মন্দ করে। একেই জল ও খাদ্য ঋতুধর্ম্মে দুষ্ট হয়, তাহার উপর আবার অগ্নির বল কম হওয়ায় আহা-রের বিদাহপাক জন্মে। এই বিদাহপাক হেতু পিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে। বর্ষার পর শরৎকাল আসিলে আকাশ পরিষ্কার হয়—পথ শুষ্ক হয় এবং সূর্য্য মেঘ-নির্ম্মুক্ত হইয়া তীক্ষ্ণ কিরণ দান করেন। এই তীক্ষ্ণ সূর্য্য-কিরণে প্রাণিদেহে বর্ষা-সঞ্চিত পিত্ত দ্রবীভূত হইয়া কুপিত হয় এবং শরৎকালে পিত্ত জন্য রোগ জন্মায়। শরতের পর হেমন্ত আসিলে বর্ষার অল্পবীর্য্য তরুণ দ্রব্য পরিণত বীর্য্য ও বলবান্ হয় বর্ষার ঘোলা জল পরিষ্কার হয়—এইরূপ খাদ্য এবং পানীয় জল সেবন করিয়া শরীরে স্নিগ্ধ, শীতল এবং উপলেপ গুণের আধিক্য জন্মে। এদিকে শীতকালে সূর্য্য কিরণের তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে এবং শীতল

বায়ুর সম্পর্কে শরীর স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্লেষ্মার সঞ্চার হয়। হেমন্তের পর বসন্ত আসিলে আবার গরম পড়িতে আরম্ভ হয় এবং সূর্য্যকিরণ প্রখর হইতে থাকে। এই সময়ে হেমন্তের সঞ্চিত কফ বিগলিত হইয়া কুপিত হয় এবং কফ জন্য রোগ জন্মাইয়া থাকে। বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিলে মানুষের খাদ্য ও পানীয় জল নিঃসার, রুক্ষ এবং অতিশয় লঘু-গুণান্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ খাদ্য ও পানীয় সেবন করিয়া শরীরের রুক্ষতা, লঘুতা ও বৈশদ্য জন্মে। সুতরাং বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং এই সঞ্চিত বায়ু বর্ষার শৈত্যে প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। যদি গ্রীষ্মের সঞ্চিত বায়ু বর্ষায়, বর্ষার সঞ্চিত পিত্ত শরতে, হেমন্তের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তে নির্হরণ অর্থাৎ বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে উহারা আর কালবল-প্রবৃত্ত রোগ জন্মাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদে যে "ঋতুচর্য্যা" কথিত হইয়াছে এই ঋতু-কৃত দোষের নির্হরণই তাহার উদ্দেশ্য। যদি নির্হরণ না করা যায় অর্থাৎ মানুষকৃত চেষ্টা যদি নাই হয় তাহা হইলেও প্রকৃতি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকেন না। কালধর্ম্মে বর্ষা ঋতুতে সঞ্চিত পিত্ত যেমন শরৎকালে কুপিত হয় তেমনিই আবার ঐ কুপিত পিত্ত হেমন্ত ঋতুতে স্বয়ংই প্রশমিত হয়। কালধর্ম্মে হেমন্তে যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় এবং বসন্তে যাহার প্রকোপ হয়, সেই কুপিত শ্লেষ্মা গ্রীষ্মকালে স্বয়ং প্রশমিত হয়। নিদাঘে কালধর্ম্মে যে বায়ু সঞ্চিত এবং বর্ষায় প্রকুপিত হয় সেই বায়ু আবার শরৎ ঋতুতে স্বয়ং প্রশমিত হয়। বৎসরের ঋতুবিশেষে যেমন দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম ঘটিতেছে দিবারাত্রির মধ্যে ও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। দিবসের পূর্ব্বাহ্নে বসন্ত-লক্ষণ অর্থাৎ কফ প্রকোপ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম-লক্ষণ অর্থাৎ শ্লেষ্মক্ষয়, অপরাহ্নে প্রাবৃট্-লক্ষণ অর্থাৎ বায়ু প্রকোপ জানিবে। এইরূপ রাত্রির প্রথম ভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যায় বর্ষা-লক্ষণ অর্থাৎ পিত্তসঞ্চয়, অর্দ্ধরাত্রে শরৎ-লক্ষণ অর্থাৎ পিত্তকোপ এবং প্রত্যূষে হেমন্ত-লক্ষণ অর্থাৎ কফ সঞ্চয় জানিবে। সম্বৎসরে এবং অহোরাত্রে কিরূপে দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং প্রশম হয় তাহা সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব। (৬) দৈববল-প্রবৃত্ত রোগ কি?—যে সকল রোগ, অথর্ব্ববেদ বিহিত মারণাদি-কারক মন্ত্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, পিশাচ ও ঔপসর্গিক রোগিসংসর্গ হেতু জন্মে সেই গুলি দৈববল-প্রবৃত্ত ব্যাধি। (৭) স্বভাববল-প্রবৃত্ত রোগ কি? ক্ষুৎ, পিপাসা, জরা, মৃত্যু, নিদ্রা প্রভৃতিকে স্বভাববল-প্রবৃত্ত রোগ বলে। কালকৃত ও অকালকৃত ভেদে ইহারা দ্বিবিধ। উচিতকালে জরা, মৃত্যু ঘটলে কালকৃত এবং তৎপূর্ব্বে ঘটিলে অকালকৃত বলে। এক্ষণে সাত প্রকার রোগের ব্যাখ্যা করা হইল। অতঃপর আমরা রোগের কারণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে কি আছে তাহাই অনুসন্ধান করিব।

রোগের কারণ কি ও কত প্রকার? চরক বলিয়াছেন—

"কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা নচাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়ানাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥"

(সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়)

ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহাই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, জিহ্বার বিষয় রস, নাসিকার বিষয় গন্ধ এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ। কাল, বুদ্ধি

এবং ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগ, অযোগ এবং অতিযোগ যাবতীয় শারীর ও মানস ব্যাধির কারণ। ইহাই উপরি উদ্ধৃত হেতু-সূত্রের মূলার্থ। এক্ষণে আমরা কাল, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ কি তাহাই ব্যাখ্যা করিব।

কালের মিথ্যাযোগ অযোগ ও অতিযোগ—গ্রীষ্মকালে অতিগ্রীষ্ম, বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও শীতকালে অতিমাত্র শীত হইলে কালের অতিযোগ হয়। গ্রীষ্মকালে ভাল গ্রীষ্ম পড়িলনা, বর্ষাকালে ভালবৃষ্টি হইলনা বা শীতকালে বেশ শীত পড়িলনা, ইহাই কালের অযোগ। আর গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তে যদি শীত হয়। বর্ষাকালে বর্ষার পরিবর্ত্তে যদি গ্রীষ্ম হয় তাহা হইলে কালের মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ স্বরূপ রোগের ত্রিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে কালের উল্লেখ করা হইল কেন? দুষ্পরিহর বলিয়া অগ্রে কালের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রজ্ঞাপরাধ ও ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগ, অযোগ, অতিযোগ আমি যত্ন লইলে পরিহার করিতে পারি কিন্তু কালের মিথ্যাযোগ, অযোগ অতিযোগ আমি বর্জ্জন করিতে পারি না। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি না হইয়া গ্রীষ্ম হয় তাহা হইলে এই আকালিক গ্রীষ্ম পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। কালের পরই বুদ্ধির উল্লেখ করিবার হেতু এই যে, বুদ্ধির দোষ না হইলে আর লোকে ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগাদির আচরণ করে না। এই বুদ্ধির দোষকে প্রজ্ঞাপরাধ বলে। প্রজ্ঞাপরাধ শব্দে এখানে শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক ক্রিয়ার অপরাধ বুঝিতে হইবে। আমরা এক্ষণে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টার অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ কি তাহাই বলিব।

কায়িক চেষ্টার অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি?—কোন দৈহিক পরিশ্রমের কার্য্য, ধরুণ পথপর্য্যটন, ইহা কায়িক চেষ্টা। যদি অতিরিক্ত পথপর্য্যটন করা যায় তাহা হইলেই কায়িক চেষ্টার অতিযোগ হইল। ইহা পীড়ার কারণ। যদি একবারে পথপর্য্যটন না করি তাহা হইলে কায়িক চেষ্টার অযোগ হইল। ইহাও পীড়ার কারণ। মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে ধারণ করা, উপস্থিত না হইলে জোর করিয়া কোঁৎ পাড়িয়া ত্যাগের চেষ্টা করা, বিষমভাবে স্খলন, বিষম গমন, বিষম পতন, বিষমভাবে অঙ্গসন্নিবেশ ও শয়ন, অঙ্গপ্রদূষণ অর্থাৎ এমন কোন কর্ম্ম করা যাহাতে গাত্র ক্ষত বা বিকৃত হয়—যেমন খুব জোরে চুলকান, অবিধি পূর্ব্বক উল্কি পরা কি নাক কাণ বেঁধা, সংক্লেশন অর্থাৎ শরীরের ক্লেশ জন্মে এমন আহার বিহার যথা—অতিরিক্ত মদ্যপান, অধিকক্ষণ রৌদ্রে কি জলে থাকা ইত্যাদি, প্রহার এবং মর্দ্দন কায়িক মিথ্যাযোগ জানিবে।

বাচিক অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি? সঙ্কল্প অর্থাৎ চিন্তা মনের কার্য্য। এই চিন্তা অতিমাত্রায় করিলে মানস অতিযোগ, চিন্তা খুব কম করিয়া আনিলে মানস অযোগ এবং ভয়, শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান, ঈর্ষা ও মিথ্যাদর্শন অর্থাৎ যেটী যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপ চিন্তা করা, মানস মিথ্যাযোগ। মানস অযোগ অর্থাৎ নিশ্চিন্ততাও রোগের কারণ। অর্শো নিদানে বলা হইয়াছে "প্রবাত-সেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্"। অতঃপর আমরা ইন্দ্রিয়ার্থের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ ব্যাখ্যা করিব।

(ক্রমশঃ)

দীর্ঘজীবীর দিনচর্য্যা।

(২) শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের জন্ম ১২৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে সুতরাং এক্ষণে ইঁহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক ৭৯ বৎসর। ইনি কলিকতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ সেন মহাশয়, সেন মহাশয়ের দিনচর্য্যা সম্বন্ধে যাহা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এস্থলে প্রকাশিত হইল। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে যে চিকিৎসক সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পজীবী, তাহার নীচেই আইন ব্যবসায়ী। সেন মহাশয় আইন ব্যবসায়ী হইয়াও সুদীর্ঘজীবী; সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত আহার বিহারাদি পাঠকগণের হিতকর হইতে পারে ভাবিয়া আমরা প্রকাশিত করিলাম। ইনি ১৮৬১ সালে আইন পাশ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন।

ভ্রমণ, পরিচ্ছদ—বিশেষ অভ্যাস।

বেড়ান অভ্যাসটা খুব কম ছিল, যখন বেড়াইতেন খুব আস্তে আস্তে চলিতেন। বাড়ীর পূজার দালানে অনেক বার পায়চারি করিতেন। পরিচ্ছদ মোটামুটি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে বিশেষ কোন পারিপাট্য ছিল না।

ইঁহার বরাবর খুব প্রত্যূষে উঠা অভ্যাস, প্রত্যূষে উঠিয়া কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করিতেন, পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া আদালতের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন, বেলা ৮টা বাজিলে আদা ছোলা ভিজান একটু লবণের সহিত খাইতেন, ৯½টা বাজিলে একটি ছোট বাটির এক বাটী ভাল সরিষার তৈল গায়ে ও মাথায় মাখিতেন, খালিপায়ে হাঁটিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করা অভ্যাস ছিল, কি শীত, কি গরম, কি বর্ষা, সকল সময়েই নিয়মিত সময়ে গঙ্গাস্নান করিতেন, স্নান করিয়া বাড়ী আসিয়া পূজা আহ্নিক করিতে বসিতেন, ৫৬৷৫৭ বৎসর বয়সের পর পূজা আহ্নিকে ও জপে অধিক ক্ষণ সময় দিতেন।

ভোজন কার্য্য কখনও তাড়া তাড়ি সম্পন্ন করিতেন না, ধীরে ধীরে অধিকক্ষণ ধরিয়া আহার করিতেন, তাঁহার বরাবর নিয়ম ছিল এবং এখনও আছে যে আহার করিতে করিতে জল আদৌ খাইতেন না এবং এখনও খান না, আহারের পর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া পরে এক গেলাস জল খান।

অধিক ভোজন কখনও করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে যখন খাইবে পেটের এক কোণ খালি রাখিয়া খাইবে, মাটীর হাঁড়িতে সিদ্ধ করা খুব সরু দাদখানি চাউলের অন্ন আর ঘন অরহরের দাল এবং তাহাতে খুব ভাল ঘৃত ঢালিয়া তাই ভাতে মাখিয়া প্রায় সর্ব্বদাই খাইতেন, হিঞ্চে শাক ইঁহার প্রিয় খাদ্য, সেই জন্য হিঞ্চে শাক সিদ্ধ কিম্বা তাহার ডালনা সর্ব্বদা খাইতেন, পটল, উচ্ছে, করলা, ঝিঞ্চে এ সকল তরকারী খুব ভাল বাসেন। পলতার বড়া এবং পলতার ডালনা প্রায় আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকেন।

যৌবন অবস্থায় কাছারীতে ২টার পর জল খাবার খাইতেন, তজ্জন্য বাড়ী হইতে লুচি, তরকারী, ভাজা ও হালুয়া প্রস্তুত করিয়া প্রেরিত হইত। ১৫ বৎসর তাঁহার এ অভ্যাস ছিল, পরে কেবল ভাল হালুয়া খাই-

তেন, কিছুকাল পরে একটী সন্দেশ এবং একটী মাত্র রসগোল্লা খাইতেন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার ও ক্রমে কমাইয়া ছিলেন। ইদানীং কাছারীতে কিছুই খাইতেন না, ৫টার পর বাড়ী আসিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া ১টি ডাবের জল, ১টি সন্দেশ, দুইখানি লুচি ও একটু তরকারী খাইতেন, রাত্রে ৫।৬খানি রুটী খাইতেন, রাত্রের খাওয়া প্রায় ৯টার সময় সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু ওকালতী হইতে অবসর লইয়া রাত্রে প্রায় ১০।১১টার সময় খাইতেন। মৎস্য কিম্বা মাংস যদিও যৌবনকালে খাইতেন, তবে খাইবার বিশেষ লোভ ছিলনা, পাঁঠার মাংস খাইতেন কিন্তু মাস দুই খাইয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়সে মৎস্য মাংস একেবারে পরিত্যাগ করেন কিন্তু পেটের অসুখের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে কখন কখন কেবল মৌরলা মাছের ঝোল খাইতেন।

যখন কলেজে পড়েন তখন হইতেই নস্য লওয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সকল সময়ে লইতেন না, এখনও সেই অভ্যাস আছে। আহারের পর ১টী মাত্র পান খাইতেন, ১০ বৎসর হইল পান আদৌ খান না। রাত্রে আহার করিয়া তখনই শয়ন করিতেন না, প্রায় এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা গল্প করিতেন। জীবনে কখনও তামাক চুরুট কিম্বা অন্য কোন নেশার বশ ছিলেন না, চা কখনও পান করেন নাই।

একটী অষ্টধাতু নির্ম্মিত আংটী এখনও অঙ্গুলীতে পরান আছে। উক্ত আংটী একব্যক্তি বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সামনে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে ইঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি কখনও পথশ্রমে ক্লান্ত হইতেন না। প্রয়োজন হইলে ২।১ ক্রোশ অনায়াসে হাঁটিতে পারিতেন।

পীড়া—ঔষধ।

একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে কিছুদিন ভুগিয়াছিলেন। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করায় একবার শিরোঘূর্ণন হইয়াছিল। তখন অনেক চিকিৎসকই মানসিক শ্রম ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু একজন বিচক্ষণ কবিরাজের ঔষধে এবং উপদেশে আরাম হইয়াছিলেন। দৃষ্টিশক্তি সমভাবেই আছে। চশমার সাহায্যে দেখিতে হয় না, যদিও এক্ষণে ৭৯ বৎসর বয়স তথাপি এখনও রাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা বেশ পড়িতে পারেন, ৪৫।৪৬ বৎসর বয়সের সময় চোখে অল্প অল্প ঝাপসা দেখিতেন এবং জল পড়িত। সেই সময় অনেকে চশমা লইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চশমা গ্রহণ করেন নাই, দুই চারি মাস একটু কষ্টের সহিত লিখিতেন ও পড়িতেন বটে কিন্তু তাহার পর সে ভাব কাটিয়া গিয়াছিল এবং চক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ হইয়াছিল। কখনও রাত্রে গ্যাসের আলো কিম্বা প্রবল কেরোসিনের আলোয় লেখা পড়া করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার বসিবার ঘরে নারিকেল তৈলের সেজের আলো এবং শয়ন-কক্ষে রেড়ীর তৈলের প্রদীপ জ্বলিত, সামান্য জ্বর কিম্বা সর্দ্দি কাসি হইলে প্রথমে আদা ও বিল্বপত্রের রস খাইতেন এবং উপবাস দিতেন, যদি তাহাতে না কমিত তখন কবিরাজ কিম্বা ডাক্তারের ঔষধ খাইতেন, আদা ও বিল্বপত্রের উপর বড়ই শ্রদ্ধা ছিল, বাড়ীতে ছোট ছেলেদের অসুখ হইলে আদা ও বিল্বপত্রের রস খাওয়াইতে বলিতেন

রাত্রে কখন কখন দুগ্ধের সহিত মনেক্কা কিম্বা কিস্‌মিস মিশ্রিত করিয়া খাইতেন।

ধর্ম্মভাব - হাইকোর্টের উকীল মাননীয় শালিগ্রাম সিং মহাশয়ের কলিকাতার ভবনে প্রায় সন্ধ্যার পর রামায়ণ পাঠ হইত, ইনি প্রত্যহ শুনিতে যাইতেন, এবং পূজার ছুটী হইলে উক্ত সিং মহাশয়ের কৈলোয়ারের উদ্যানভবনে যাইতেন, তথায় অনেক গুলি বিহারী ভদ্রলোক একত্র হইয়া সমস্বরে রামায়ণ পাঠ করিতেন। পাঠ শুনিয়া ইঁহার ভাবের উদয় হইয়া চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু পতিত হইত। এরূপ ভক্ত শ্রোতা পাইয়া তাঁহারাও আনন্দের সহিত রামায়ণ পাঠ করিতেন। কৈলোয়ারে অবস্থিতিকালে অনেকক্ষণ শোণ নদীর সৈকতে বসিয়া তুলসী দাসের রামায়ণ গান করিতেন।

৭৫ বৎসর বয়সে ওকালতী হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ করেন, তখন সকল সময়ে বাসায় বসিয়া নিরন্তর জপ করিতেন, বেড়ান একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আহার খুব কমাইয়াছিলেন।

এক্ষণে ৭৯ বৎসরে পড়িয়াছেন, শরীরে কোন ব্যাধি নাই তবে চলিবার শক্তি একেবারে খুব কম, দৃষ্টি শক্তি সমান আছে, চশমার আবশ্যক হয় না।

আম্র।*

[কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত]

সকল ফলের শ্রেষ্ঠ হয় আম্র ফল।
ভক্ষণেতে সখ্য-ভাব, ফলে মোক্ষ ফল॥
সহকার সহ কার তুলনা বা দিব?
অনন্ত মহিমা তা'র ইঙ্গিতে কহিব।

শুন সবে রসালের জন্ম বিবরণ।
নিমেষে ত্রিতাপ জ্বালা হবে নিবারণ॥
লঙ্কাপুরে দশানন আপন বাগানে।
রেখে ছিল পুঁতে গাছ অতি সাবধানে॥

---

* ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর শেষ কবি। একজন রসিক লেখক "মাছের ঝোলের" সঙ্গে গুপ্ত কবির কাব্যের তুলনা দিয়াছিলেন, "নবজীবনের" পাঠক বর্গের তাহা অবিদিত নাই। মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি—তাঁহার সহজ ধর্ম্ম ছিল। যাঁহারা বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুপ্ত কবির শিষ্য। এমন কি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র এবং নাটককার দীনবন্ধুও গুপ্তকবির ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় গুপ্তকবিকে বাঙ্গালী ভুলিতে বসিয়াছে। উদীয়মান লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায় ও হেমেন্দ্র কুমার—মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রসঙ্গ লইয়া একটু নাড়া চাড়া করেন, গুপ্তকবির ঋণ আর কেহই বোধ হয়, স্বীকার করেন না। বৈদ্য জাতির মধ্যে ও আর ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনা দেখিতে পাইনা।

গুপ্তকবির বাটী ছিল—কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। বাটিটী এখন ও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এখন সেই নবরসের আধার কবিকুঞ্জে—একঘর কুম্ভকার আসিয়া "চাক্" ঘুরাইতেছে। বৈদ্য বংশের কোনও ধন কুবের, জাতীয় কবির স্মৃতি রক্ষার জন্য—বাটিটি কিনিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কতকগুলি কবিতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কাঁচড়া পাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কবিতা গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি জীর্ণ কীটদষ্ট কাগজে—ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পতিত। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে এম্ এ—আমাদিগকে কবিতাগুলি দান করিয়াছেন। এজন্য গুপ্তকবির প্রতিবাসী সতীশ বাবুকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে কবিতাগুলি—খাদ্য তত্ত্বের উপযোগী হইবে, আমরা সে গুলি ক্রমশঃ "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত করিব।

সীতা-অন্বেষণে গেলে বীর হনুমান।
জানকী জানান তাঁরে আমের সন্ধান॥
শুনি রাম-দাস বড় পাইল আরাম।
জয়রাম ব'লে কপি ভাঙ্গিল আরাম॥
শাঁস খেয়ে আঁটী বীর দিল ছড়াইয়া।
সে আঁটীতে হ'ল গাছ ব্রহ্মাণ্ড ব্যপিয়া॥
হনুক প্রসাদে তৃপ্ত মনুর সন্তান।
রামায়ণে এ কথার রয়েছে প্রমাণ॥
যে বানর আমগাছ মর্ত্ত্যে আনিয়াছে।
তা'র বংশধর যদি ওঠে তা'র গাছে।
লাঠি মারি, ঢিল ছুঁড়ি, গাল পাড়ি কত!
অকৃতজ্ঞ কেবা আছে আমাদের মত?
হনুর সে উপকার কেহ নাহি মানে।
গুণীর আদব কিন্তু ইংরাজেরা জানে॥
ধন্য দাদা! ডারুইন! তুমি বুদ্ধিমান!
"আদি" ব'লে বানরের বাড়ায়েছ মান।
তোমাদের বর্ণ সাদা, মনটীও সাদা।
সেইগুণে আমরা ত ঝুরে মরি দাদা।
প্রথমে যে যে জিনিষ করে আবিষ্কার।
তোমরা তখনি তা'রে দাও পুরস্কার॥
মাঘের প্রথমে ধরে বৃক্ষেতে মুকুল।
গন্ধ পেয়ে অন্ধ হ'য়ে, নারী ছাড়ে কুল॥
শর ব'লে ফুল-শর তুলে রাখে তূণে।
কে না হয় বিমোহিত রসালের গুণে?
ফাল্গুনেতে বাঁধে 'গুটী', চৈত্রে ধরে ধাঁচা।
বৈশাখে রাকড়া ভাব—বয়সটা কাঁচা!
জ্যৈষ্ঠ মাসে পেকে হয় অতি সুমধুর।
সেরসে বিরস লাগে অধর বধূর!
মনোহর কলেবর মানস টলায়।
দেখা মাত্র জল সবে অমনি নোলায়!
কুঁড়ে বেঁধে ব'সে থাকি গাছের তলায়।
কেবল আহার করি গলায় গলায়!
যত পাই, তত খাই, আশা নাহি মেটে।
ইচ্ছা হয় সব শুদ্ধ পুরে ফেলি পেটে!
হায় বিধি! এ ফলেতে কেন দিলে আঁটী!
আপনি আপন সৃষ্টি করিয়াছ মাটী।
মধু চেয়ে মিষ্ট ব'লে "মধুফল" নাম।
লিখেছেন কত [illegible] বৈদ্য গুণ-ধাম।
যা'র বরে বিরাজিত গাছ পাকা আম।
তা'র করতলে—ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
বল বর্ণ রক্ত মাংস শুক্র বৃদ্ধি করে।
কিছু শ্লেষ্মাকর, কিন্তু বায়ু পিত্ত হরে॥
কচি আমে ঝোল খেলে দেহ ঠাণ্ডা হয়।
সিদ্ধ আম, স্নিগ্ধ গুণে স্বেদ করে ক্ষয়।
কেশী-চূর্ণ উপকারী বমি অতিসারে।
বোঁটার আঠার তেলে চুলকণা সারে॥
পাতার রসেতে নাশে রক্ত—আমাশয়।
ছাল বেটে লেপ 'দলে ব্যথা ভাল হয়।
সুখসেব্য "আম্র খণ্ড" ভেষজ প্রধান।
খেলে, বৃদ্ধ যুবা সম হয় বলবান॥
নিত্য গৃহে অন্নাভাব -দীন দুঃখী যা'রা।
আম খেয়ে একমাস পেট পালে তা'রা॥
গুড় সহ 'আম্সীর' মধুর অম্বল।
অরুচিতে পোয়াতীর প্রধান সম্বল!
মসলা মাখিয়া আম তেলে রাখ ফেলে।
"আম্রতেল" নাম তা'র প্রাণ ঠাণ্ডা খেলে!
কাঁচা আম ফালা দিয়ে আতপে শুখাবে।
অকালে আমের স্বাদ—"আমচুরে" পাবে॥
খোসা ছাড়াইয়া আম ঢেঁকিতে কুটিয়া।
সরিষা হরিদ্রা আর লুণ মাখাইয়া,
নূতন হাঁড়ীতে ক'রে যত্নে রাখ তুলে।
মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিও সরা খানি তুলে।
"কাসুন্দীর" সঙ্গে রেঁধে ইলিসের টক্,
সেই কালে খেতে—যা'র প্রাণে আছে সখ্,
কারও বাড়ী দেখে যদি আমের আচার,
লজ্জা খেয়ে পরনারী করেনা আচার।
ঘন দুগ্ধে আম্ররস—অমৃত সমান!
দৈবে পেলে, সুধা ফেলে, দেবরাজ খান!
কানিতে ছাঁকিয়া রস রৌদ্রেতে শুখাও।
অসময়ে রসময় 'আমসত্ত্ব' খাও॥
শিলা বৃষ্টি ঝড়, পাখী, কুয়াসা, তস্কর,
আমের এ পঞ্চ শত্রু—খ্যাত চরাচর!
এড়ালে এদের হাত, তবে ফল পাই।
আত্মীয় গণেরে ল'য়ে পেট ঠেসে খাই॥
একাকী গোপনে আম খেওনাক' কেউ।
হন্যা হ'য়ে মরে যাবে ডেকে ফেউ ফেউ॥
নিজে খাবে, বিলাইবে, পরকে খাওয়াবে।
তা' হ'লেই, স-শরীরে স্বর্গে চ'লে যাবে।
যাঁহার কিঙ্কর হ'তে পেয়েছ এ আম,
আম খেয়ে নাম তাঁর জপ অবিরাম।

বৈদ্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

অনুবাদ:—জঙ্ঘা বা উরুদেশ ভগ্ন হইলে কপাট-শয়ন হিতকর। বন্ধন জন্য পাঁচটী কীলক (খোঁটা) এরূপ ভাবে রাখিবে যেন ভগ্নস্থান চালিত না হয়। সন্ধিস্থলের দুই দিকে দুইটী করিয়া, পদতলে একটী, শ্রোণী-দেশে, পৃষ্ঠবংশে বা বক্ষে একটী এবং স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে একটী কীলক দিয়া ভগ্ন রোগীকে বন্ধন করাই বিধি।

কিরূপে ভগ্নস্থান বন্ধন করিতে হয়, কোন ঋতুতে কত দিন অন্তর বন্ধন পরিবর্ত্তন করিতে হয়, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের উত্তরস্থানে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বে অস্থি ছেদনার্থ যে করপত্র (করাত) নামক শস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অঙ্গ-চ্ছেদনের (Amputation) জন্য করপত্র প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ভগ্নরোগে অস্থি-চ্ছেদনের নাম মাত্র উল্লেখ নাই কেন? এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে অস্থিচ্ছেদনের বিষয় অবগত হইলেও চিকিৎসা শাস্ত্রের কলঙ্ক স্বরূপ অস্থিচ্ছেদন কার্য্যে চিকিৎ-সকদিগকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্য বোধ হয় ভগ্নরোগে অস্থিচ্ছেদনের স্পষ্ট উপদেশ দেন নাই। যদিও সময়ে সময়ে অঙ্গচ্ছেদন না করিলে রোগীর বিপত্তি ঘটিতে পারে বলিয়া অঙ্গচ্ছেদন আবশ্যক হইয়া থাকে তথাপি অঙ্গচ্ছেদনকে কখনই সুচিকিৎসা বলা যাইতে পারে না। যদি প্রয়োজনীয় অঙ্গচ্ছেদন করিয়াই রোগীকে আরোগ্য করিতে হয় তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের ফলবত্তা কোথায়? আর রোগীকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া রোগমুক্ত করিলে তাহাকেই বা কুচিকিৎসা বলিবনা কেন? কিত ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিত শব্দের অর্থ রোগাপনয়ন, সুতরাং রোগ নাশ করা-কেই চিকিৎসা বলে। কিন্তু এখানেত রোগ নাশ করা হইল না। রোগীর অঙ্গনাশ করা হইল। সুতরাং ইহাকে চিকিৎসা কি করিয়া বলিব? নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অঙ্গচ্ছেদন ব্যতীত যে রোগ আরোগ্য হইতে পারিত, এরূপ অনেক স্থলে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ অঙ্গচ্ছেদন করিয়া থাকেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষতঃ শস্ত্র চিকিৎ-সার ভিত্তি স্বরূপ শব-ব্যবচ্ছেদ (Dissection) সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন:—

ত্বক্‌পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনং॥

তস্মাৎ সমস্ত-গাত্র মবিষোপহত মদীর্ঘ-ব্যাধিপীড়িত মবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমপহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনা মন্যতমেনা বেষ্টিতাঙ্গ মপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ, সম্যক্ প্রকুথিত-ঞ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণু বল্কলকূর্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরাবর্ষয়ং-স্ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশে-ষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষেতি।

অনুবাদ :—শরীরের ত্বক্ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করা হইল এই শল্যতন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন তন্ত্রে তাহা বর্ণিত হয় নাই। শরীরে প্রবিষ্ট শল্য আহরণ করিতে হইলে শরীরের কোথা কি আছে তাহার নিঃসংশয় জ্ঞান থাকা উচিত। এই নিঃসংশয়জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মৃতদেহ শোধন করিয়া অঙ্গবিনিশ্চয় করা উচিত। কারণ প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্ররূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া শিক্ষা করিলে তবে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সেইজন্য সম্পূর্ণাঙ্গ, বিষের দ্বারা মৃত নহে, অত্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাধি পীড়িত নহে এবং এক শত বৎসর অপেক্ষা কম বয়স্ক পুরুষের মৃতদেহ সংগ্রহ পূর্ব্বক অন্ত্র ও পুরীষ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। অনন্তর মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ) বল্কল, কুশ বা শণ যে কোন একটী দ্রব্য দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া একটী পঞ্জরের (খাঁচা) মধ্যে রাখিয়া স্রোতোহীন নদীতে নির্জ্জনে রাখিয়া পচাইবে। উত্তমরূপ পচিলে সাত দিন পরে উদ্ধৃত করিয়া বেণার মূল, কেশ, বা বাঁশের ত্বক, ইহাদের যে কোন একটীর কূচী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্য এবং অভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল চক্ষু দ্বারা দেখিবে।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশে লর্ড লিষ্টার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এণ্টিসেপ্‌টিক্ (antiseptic) নামক যে বিষ-প্রতিষেধক চিকিৎসার প্রচার করিয়াছেন তাহাও আয়ুর্ব্বেদকারগণের অবিদিত ছিল না। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ধূলা ও মক্ষিকা রোগজীবানুবাহক বলিয়া ব্রণ রোগীকে ঐ সকল পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, ঠিক এই কারণেই প্রাচীন সুশ্রুত গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে :—

ব্রণমভিমৃশ্য প্রক্ষাল্য কষায়েণ প্রোতেনোদকমাদায় তিল-কল্ক-মধু-সর্পিঃ প্রাগাঢ়ামৌষধযুক্তাং বর্ত্তিং প্রণিদধ্যাৎ............ততো গুগ্গুল্বগুরুসর্জ্জরসবচাগৌরসর্ষপচূর্ণৈর্লবণনিম্বপত্রব্যামিশ্রৈরাজ্যযুক্তৈ র্ধূপৈর্ধূপয়েদ্বিতি।

অনুবাদ :—ব্রণ পীড়নও কষায় জল দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। পরে তিলবাটা, মধু ও ঘৃত গাঢ়রূপে মিশ্রিত বর্ত্তিতে (Lint) মাখাইয়া ব্রণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।.........অনন্তর গুগ্‌গুল্ ধুনা, অগুরু, বচ, শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ করিয়া লবণ, নিম্বপত্রও ঘৃত সহ ধূপ প্রস্তুত করিবে এবং সেই ধূপের ধূম ব্রণে লাগাইবে।

মধু ও ঘৃত উৎকৃষ্ট বিষ প্রতিষেধক (antiseptic) এবং উক্ত ধূম প্রয়োগ দ্বারাও ব্রণ বিষাক্ত (Septic) হইবার ভয় নিরাকৃত হয়।

কল্পতরু সদৃশ আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে কেবল শস্ত্র প্রয়োগ নহে, পরন্তু ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিষয়েও সুন্দর উপদেশ আছে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগের বিধি এরূপ উৎকৃষ্ট এবং অব্যর্থ, যে তাহার নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিধি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

মহামতি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

শস্ত্রানুশস্ত্রেভ্যঃ ক্ষারঃ প্রধানতম শ্ছেদ্যভেদ্যলেখ্যকরণা ত্রিদোষঘ্নাদ্বিশেষ-ক্রিয়া-করণাচ্চ। স দ্বিবিধঃ প্রতিসারণীয় পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়-কুষ্ঠকিটিম-দদ্রুকিলাস-মণ্ডল ভগন্দরার্ব্বুদ-দুষ্টব্রণ-নাড়ী-চর্ম্মকীল-তিলকালক-ন্যচ্ছ-ব্যঙ্গ-মশক-বাহ্য-বিদ্রধি-ক্রিমি-বিষার্শঃস্বপদিশ্যতে; সপ্তসু চ মুখরোগেষ্বপজিহ্বাধি-

জিহ্বোপকুশ-দন্ত-বৈদর্ভেষু তিন্দ্বষু চ রোহিণী যেতেষু চৈবানুশস্ত্রপ্রণিধানমুক্তং। পানীয়স্তু গরগুল্মোদরাগ্নি-সঙ্গা-জীর্ণারোচকানাহ-শর্করা-শ্মর্য্যাভ্যন্তরবিদ্রধি-ক্রিমি-বিষার্শঃস্বপযুজ্যতে।

অনুবাদ :—শস্ত্র এবং অনুশস্ত্র (অগ্নি জলৌকা) অপেক্ষা ক্ষার শ্রেষ্ঠ। কারণ ছেদ্য ভেদ্য ও লেখ্য কারক, ত্রিদোষনাশক এবং বিশেষ ক্রিয়াকারক। ক্ষার দুই প্রকার, যথা প্রতিসারণীয় এবং পানীয়। তন্মধ্যে প্রতিসারণীয় ক্ষার কুষ্ঠ, কিটিম, কিলাস, দদ্রু, মণ্ডল, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, দুষ্টব্রণ, নাড়ীক্ষত, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, মশক, বাহ্য-বিদ্রধি, ক্রিমি, বিষ, অর্শঃ, সাত প্রকার মুখ-রোগ এবং তিন প্রকার রোহিণী রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আর পানীয় ক্ষার দুষীবিষ, গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা, অশ্মরী, অন্তর্ব্বিদ্রধি কৃমি, বিষদোষ ও অর্শঃ রোগে প্রয়োগ করা যায়।

ক্ষারাদগ্নির্গরীয়ান্ ক্রিয়াসু ব্যাখ্যাতস্ত-দ্দগ্ধানাং রোগাণামপুনর্ভাবাদ্ভেষজ-শস্ত্রক্ষারৈরসাধ্যানাং তৎসাধ্যত্বাচ্চ, অথেমানি দহনোপকরণানি। তদ্যথা। পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্ত-শর-শলাকা--জাম্ববৌষ্ঠেতর-লোহাক্ষৌদ্র--গুড়-স্নেহাশ্চ। তত্র পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্তশরশলাকাস্ত্বগ্‌গতানাং। জাম্ববৌষ্ঠেতর-লোহানি মাংসগতানাম্। ক্ষৌদ্রগুড়স্নেহাঃ শিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিগতানাম্।

অনুবাদ :—ক্ষার অপেক্ষা অগ্নি শ্রেষ্ঠ, ইহা অগ্নি প্রয়োগের ফল দেখিয়া বুঝা যায়। অপিচ, অগ্নিদগ্ধ ব্যাধির পুনরায় উৎপত্তি হয় না এবং ঔষধ, শস্ত্র ও ক্ষারের অসাধ্য ব্যাধিও অগ্নি প্রয়োগে প্রশমিত হইয়া থাকে। পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা জাম্ববৌষ্ঠ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্যাদি, মধু, গুড় এবং ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য দহন কার্য্যের উপকরণ। তন্মধ্যে পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত শর ও শলাকা ত্বক্‌গত রোগে, জাম্ববৌষ্ঠ, লৌহ, তাম্র ও রজতাদি মাংসগত রোগে আর মধু ও ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য সিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত ও অস্থিগত রোগে দহন কার্য্যে ব্যবহার্য্য।

বিষয় বাহুল্য এবং সময় সংক্ষেপ ভয়ে এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে পারিলাম না। কিন্তু এতদ্দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে আয়ুর্ব্বেদে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

অনন্তর আমরা ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া শল্য তন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে চতুর্থ মাসে ভ্রূণের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতেও অষ্টাদশ সপ্তাহ কাল হইতে বিংশতি সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের হৃদ্‌যন্ত্র রক্ত সঞ্চালন (Feetal circulation) করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দিগের এই আধুনিক আবিষ্কার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীনগণ অবগত ছিলেন।

মূঢ়গর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

নাতঃকষ্টতমমস্তি যথা মূঢ়গর্ভশল্যোদ্ধরণ মত্র হি যোনিযকৃৎ-প্লীহান্ত্রবিবরগর্ভাশয়ানাং মধ্যে কর্ম্ম কর্ত্তব্যং স্পর্শেন। উৎকর্ষণাপকর্ষণস্থানাপবর্ত্তনোদ্বর্ত্তন ভেদনচ্ছেদনপীড়ন-র্জ্জুকরণ দারণানি চৈকহস্তেন গর্ভং গর্ভিণীং বা হিংসতা, তস্মাদধিপতিমাপৃচ্ছ্য পরঞ্চ যত্নমাস্থায়োপক্রমেৎ।

অনুবাদ :—মূঢ়গর্ভের শল্যোদ্ধারের ন্যায় কষ্টতম আর কিছুই নাই। ইহাতে যোনি,

যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রবিবর ও গর্ভাশয়ের মধ্যে স্পর্শ দ্বারা কার্য্য করিতে হয় এবং উৎকর্ষণ (উপরের দিকে তোলা), অপকর্ষণ (নীচু দিকে নামান), স্থানাপবর্ত্তন ভ্রূণকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অধোমুখে আনয়ন) উদ্বর্ত্তন (আধোমুখ ভ্রূণকে উত্তান করা), ছেদন ভেদন, পীড়ন, ঋজু করণ ও দারণাদি এক হস্ত দ্বারাই করিতে হয়। ইহাতে গর্ভ বা গর্ভিনীর হিংসা হইতে পারে বলিয়া গর্ভিণীর স্বামীকে ও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক কার্য্য করিবে।

গর্ভের অবরোধ এবং তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

মৃতেচোত্তানায়া আভুগ্নসক্থ্যা বস্ত্রাধারকোন্নমিতকট্যা ধন্বনগ-মৃত্তিকা-শাল্মলীমৃৎস্ন-ঘৃতাভ্যাং ম্রক্ষয়িত্বা হস্তং যোনৌ প্রাবিশ্য গর্ভমুপহরেৎ। তত্র সক্থিভ্যামাগতমনুলোমমেবাকর্ষেৎ। এক-সক্থ্যা প্রপন্ন-স্যতের সক্থি প্রসার্য্যাপহরেৎ। স্ফিগ্ দেশেনাগতস্য স্ফিগ্ দেশং প্রপীড্যোর্দ্ধ মুৎক্ষিপ্য সক্থিনী প্রসার্য্যাপহরেৎ। তির্য্যগাগতস্য পরিঘস্যেব তিরশ্চীনস্য পশ্চাদর্দ্ধমূর্দ্ধ মুৎক্ষিপ্য পূর্ব্বার্দ্ধমপত্যপথং প্রত্যার্জ্জব মানীয়াপহরেৎ। পার্শ্বাপবৃত্ত শিরসমংসং প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য শিরোঽপত্যপথমানীয়াপহরেৎ। বাহুদ্বয় প্রতিপন্নস্যোর্দ্ধমুৎপীড্যাংসৌ শিরোঽনুলোমমানীয়াপহরেৎ।

অনুবাদ :—গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে গর্ভিণীকে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া উরুদ্বয় অল্প বক্রভাবে সংস্থাপন পূর্ব্বক কটির নিম্নদেশে বস্ত্রাধার রাখিয়া কটি উন্নত করিবে। অনন্তর ধন্ববৃক্ষ, গিরিমৃত্তিকা, শাল্মলীনির্য্যাস ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা হস্তে মাখাইবে এবং সেই হস্ত যোনি পথে প্রবিষ্ট করিয়া সন্তান বাহির করিবে। গর্ভস্থ সন্তানের উভয় সক্থি বাহির হইয়া অনুলোম ভাবে (নীচের দিকে) টানিয়া বাহির করিবে। এক সক্থি বাহির হইলে অপর সক্থি প্রসারিত করিয়া টানিয়া বাহির করিবে। নিতম্বদেশ প্রসব পথে উপস্থিত হইলে নিতম্ব দেশ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সক্থি দ্বয় প্রসারিত করিয়া বাহির করিবে। ভ্রূণ পরিঘের (হুড়কা) ন্যায় তির্য্যক্ ভাবে থাকিলে পায়ের দিক উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মস্তক নিম্ন দিকে আনিয়া বাহির করিবে। ভ্রূণের মস্তক পার্শ্ব দেশে অপবর্ত্তিত হইয়া অবস্থিতি করিলে এবং স্কন্ধ অপত্য পথে আসিলে স্কন্ধ উর্দ্ধে ঠেলিয়া মস্তক অপত্য পথে অসিলে স্কন্ধ দেশ উর্দ্ধদিকে তুলিয়া মস্তক অপত্য পথে আনিয়া বাহির করিবে।

গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদন এবং বহিষ্করণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

তত্র স্ত্রিয়মাশ্বাস্য মণ্ডলাগ্রেণাঙ্গুলীশস্ত্রেণ বা শিরো বিদার্য্য শিরঃ কপালান্যাহৃত্য শঙ্কুনা গৃহীত্বোরসি কক্ষায়াং বাপহরেৎ। অভিন্নে শিরসি চাক্ষিকূটে গণ্ডে বা অংসসক্তস্যাংসদেশে বাহুং ছিত্ত্বা দৃতি মিবাততং বাতপূর্ণোদরং বা বিদার্য্য নিরস্যান্ত্রাণি শিথিলীভূতমাহরেৎ। জঘনসক্তস্য বা জঘন কপালানীতি।

যদ্যদঙ্গং হি গর্ভস্য তস্য সজ্জতি তত্ত্বিষক্।
সম্যগ্বিনিহরেচ্ছিত্ত্বা রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্নতঃ॥
গর্ভস্য গতয়শ্চিত্রা জায়ন্তেঽনিলকোপতঃ।
তত্রানল্পমতির্বৈদ্যো বর্ত্তেত বিধিপূর্ব্বকম্॥
নোপেক্ষেত মৃতংগর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ।
স হ্যাশু জননীংহন্তি নিরুচ্ছ্বাসং পশুং যথা॥
মণ্ডলাগ্রেণ কর্ত্তব্যং ছেদ্যমন্তর্ব্বিজানতা।
বৃদ্ধিপত্রং হি তীক্ষ্ণাগ্রং নারীং হিংস্যাৎ কদাচন।

অনুবাদ: গর্ভিণীকে আশ্বাসিত করিয়া মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলীশস্ত্র দ্বারা প্রথমে গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া শঙ্কু (আকর্ষণী) দ্বারা আকর্ষণ করিয়া খণ্ডীকৃত খর্পর সকল নির্গত করিবে এবং বক্ষ ও কক্ষদেশ ধরিয়া টানিয়া নির্গত করিবে। মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারিলে অক্ষিকূট বা গণ্ড দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বাহির করিবে। মৃত সন্তানের স্কন্ধ দেশ দ্বারা অপত্য পথ সংরুদ্ধ হইলে বাহু ছিন্ন করিয়া বাহির করিবে। ভ্রূণের উদর দৃতির (ভিস্তি, মশক) ন্যায় বায়ুপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিলে উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্র সকল নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে দেহ শিথিল হইয়া পড়িলে টানিয়া বাহির করিবে। জঘন দেশ দ্বারা অপত্য পথ রুদ্ধ হইলে জঘন দেশের অস্থি কাটিয়া বাহির করিবে।

গর্ভের যে অঙ্গ অপত্য পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে প্রথমে সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া গর্ভিণীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ ভ্রূণের নানা প্রকার গতি হইয়া থাকে। কিন্তু চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় বিধি পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত গর্ভকে মুহূর্ত্তমাত্রও উপেক্ষা করিবেন না। কারণ উহা জননীকে রুদ্ধশ্বাস পশুর ন্যায় সত্বর বিনষ্ট করিয়া থাকে। মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারাই মৃতগর্ভ ছেদন করা উচিত। বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া প্রসূতিরও কখন কখন অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

হে মহাভাগগণ! আমরা যে সকল শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিলাম তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ কি বলিতে পারেন যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধাত্রীবিদ্যা ও শস্ত্র চিকিৎসা ছিল না বা সামান্য ভাবে ছিল? এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতেও যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে শস্ত্র চিকিৎসা-কৌশল বিহীন বলেন আমি তাঁহাদিগকেই এই কথা বলিতেছি যে হয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানহীনতা, নচেৎ আভিজাত্যাভিমানিতা তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে বাধ্য করিয়া থাকে।

অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও যে আয়ুর্ব্বেদীয় শস্ত্র চিকিৎসা পরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়। মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার চার্লস্ মহোদয়ের কৃত কার্য্যের বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ অভিধানে এসম্বন্ধে কি লিখিত হইয়াছে শ্রবণ করুন:—

In both branches of the Aryan stock surgical practice (as well as medical) reached a high degree of perfection at a very early period. It is a matter of controversy whether the Greeks got their medicine (or any of it from the Hindus (through the medium of Egyptian priest hood), or whether the Hindus owed that high degree of medical and surgical knowledge and skill which is reflected in Charaka and Susruta (commentators of uncertain date on Yajurvade) to their contact with western civilisation afier the campaigns of Alexander. The evidence in favour of the former view is ably stated by wise in the introduction to his hietory of medicine among the Asiatics. The correspondence between the Susruta and Hipprocratic collection is closet in the sections relating to